15549

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস

Presented to the Assam Sahitya Sabha. Kindly acknowledge receipt to the Author.
7/5/42

শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী,
এম্, এস্-সি, বি, এল

১৯৪০ ইং

15549

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী, এম, এস্-সি, বি, এল।

সং. ২৭৬/৭৮
তাং. ৭।৬।২০০০

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

উৎসর্গ পত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সহচর
শ্রীহট্ট গৌরব পণ্ডিত মুরারী গুপ্তের
পুণ্য নামে "শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস"
উৎসর্গ করিলাম।

২৭৬।৭৮১

শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত।

ভূমিকা

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে আমরা শ্রীহট্টের হিন্দু-রাজত্বকাল বা মুসলমানপূর্ব্ব ইতিহাসকে লক্ষ্য করিতেছি। বর্ত্তমান পুস্তকে শ্রীহট্ট জিলার লাউড়, গৌড়, জয়ন্তিয়া, ব্রহ্মাঞ্চল (দক্ষিণ গৌড়) মগধ (করিমগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছত্রচূড়া, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থান লইয়া অবস্থিত), তুঙ্গনাথাঞ্চল বা তরপের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি সূত্র দেওয়া হইয়াছে। শ্রীহট্টের প্রচ্ছন্ন মহাপীঠ (৺ গ্রীবাপীঠ) সম্বন্ধেও লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সূত্রাকারে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল।

এই পুস্তকের কতকগুলি সূত্র অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করিলে তাম্রফলক, প্রাচীন লিখা, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন জিনিষ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস লইয়া যাঁহারা গবেষণা করিবেন, তাঁহাদের গবেষণাতে যদি বর্ত্তমান পুস্তক সামান্য মাত্রও সাহায্য করে, তবে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

হরিনগর,
পোঃ তাজপুর, জিং শ্রীহট্ট
১।৬।১৩৪৭ বাং

শ্রী কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীহট্ট প্রাচীন ভূমি। ইহার একটী প্রাচীন ইতিহাস নিশ্চয়ই থাকিবে। শ্রীহট্টে একান্নটী মহাপীঠের (হিন্দু তীর্থস্থান) মধ্যে একটী মহাপীঠের স্থান। (জয়ন্তিয়া বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত, সেইস্থানেও অন্য একটী মহাপীঠ আছে, ভারতবর্ষ মধ্যে অন্য কোন জিলাতে দুইটী মহাপীঠ আছে কি না সন্দেহ)।

মহাপীঠের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়া নানাজনে নানাভাবে বিতর্ক করিতে পারেন। তবে যে সকল স্থানে ঐ সকল মহাপীঠ বর্ত্তমান সেই সকল স্থান যে প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার এক একটী কেন্দ্র ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই।

আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান শ্রীহট্ট নগরের ভৌগলিক অবস্থিতি, শ্রীহট্টের মহাপীঠের (গ্রীবা মহাপীঠের) সহিত অপ্রত্যক্ষভাবে কতকটা সংশ্লিষ্ট আছে। মহাপীঠের সান্নিধ্যেই হিন্দু রাজধানী এবং হিন্দু রাজধানী উপলক্ষেই মুসলমান তৎপর ইংরেজ আমলের শ্রীহট্ট রাজধানী।

প্রাচীনকালে অবশ্য শ্রীহট্ট বর্ত্তমানের ন্যায় বিস্তৃত কলেবর ছিল না, তৎকালে সমুন্নত উচ্চতর ভূমিসকল ছাড়া শ্রীহট্ট জিলার বিস্তৃত সমতল ও নিম্ন ভূমি সকল (সদর মহকুমার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার উত্তর পশ্চিমাংশ, করিমগঞ্জ মহকুমার হাকালুকি প্রভৃতি অংশ বিশেষ, হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ মহকুমা), ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ, ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ ও ঢাকা জিলার অংশ বিশেষ লইয়া বঙ্গোপসাগরের একটী শাখাসাগরের (অথবা একটী বৃহৎ হ্রদের) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"৺গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ" নামক একখানি পুস্তিকা আমরা ১২।১১।৪৪বাং প্রকাশ করি। ইহা কবি ৺গণেশরাম শিরোমণির রচিত হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধার অবলম্বনে লিখিত। উক্ত হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধার—সংক্ষিপ্ত, কামরূপ, গৌড়, শ্রীচৈল, ব্রহ্মাচল, গোবিন্দ ও শ্রীহট্ট এই সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত নানা তথ্যপূর্ণ প্রায় ৩৬০০০ ছয়ত্রিশ হাজার ছত্র পয়ারে লিখিত। পুস্তকের শেষদিকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

"৺গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ" অতি সংক্ষেপে লিখা। ইহাতে শ্রীহট্টের গৌড় রাজবংশাবলী ও রাজাগণের রাজ্যকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে পাচালী লিখিত ইতিহাসটী ও গৌড় বংশাবলী (১০-১১ পৃষ্ঠায়) দিতেছি। ইহাতে আমাদের পুস্তকে আলোচ্য বিষয় অনুধাবণে পাঠকের কতক সুবিধা হইবে।

কামরূপের কামসিন্ধু রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার রাণী (উর্মিরাণী) প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া শ্রীহট্টের উত্তর দিগবর্ত্তী জৈন্তা পাহাড়ের সংলগ্ন নারীরাজ্যের অংশ বিশেষে (গ্রীবাপীঠের সান্নিধ্যে) একটী রাজ্যের পত্তন করেন।

তিব্বত হাটক নগরের যুবরাজ কুষক (পিতা চন্দ্রবংশীয় ও মাতা গন্ধর্ব্ব বা তিব্বতীয়) চন্দ্রভাগা নদীতীর আশ্রয় ক্রমে ভারত ভ্রমণে আগমণ করেন। ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে যুবরাজ (মাতামহ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী) কুষক তিব্বতীয় অনুষঙ্গীগণ সহ নারীরাজ্যে আগমণ করেন। যুবরাজ কুষক উর্মি-রাণীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাহার অনুষঙ্গীগণ মধ্যে অনেকেই এদেশবাসী হয়েন। কুষকের এক পুত্র জন্মে তাঁহার নাম হাটক (কুষকের পিতৃধাম হাটক-নগরের স্মরণার্থে পুত্রের নাম হাটক)। কুষক হইতে ঐ বংশের উৎপত্তি হওয়ায় ঐ রাজবংশকে "কুষক বংশীয়" বলিয়াও অভিহিত করা হইত। হাটকের জন্মের পর কুষক তিব্বত চলিয়া যান। এবং জীবনে ২।১ বার নারীরাজ্যে আগমণ করেন। হাটক বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যাধিকারী হন। হাটকের নামে পীঠ ভৈরব হাটকেশ্বর নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়েন।

হাটকের পুত্র গুহক। তিনি কুলদেবতা ৺ কংসনিসূদন স্থাপন করেন। গুহকের তিন পুত্র লড্ডুক, গুড়ক, জয়ন্তক ও দুই কন্যা শীলা ও চটলা। গুহক রাজা শীলা কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ রাজধানীর সান্নিধ্যে (অগ্নিকোণে) শীলাহট্ট নামে হাট স্থাপন করেন। চটলা কন্যা কলুষিতা হওয়ায় তাহাকে দক্ষিণসাগর দ্বীপে নির্ব্বাসিতা করা হইলে সে তথায় চট্টলরাজ্য বিস্তার করে। (শীলা ও চটলার নামে শীলি-চটল দেশ)।

কুষকরাজার তিব্বতীয় অনুষঙ্গীগণের পরবর্ত্তী বংশধরগণই শ্রীহট্টের পাত্র বা পাতরগণ হইতে পারেন কি না (নানা কারণে তাহারা বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত

হইতে পারে) এবং হাটক, গুহক, লড্ডুক, গুড়ক, জয়ন্তক ইত্যাদি নামে তিব্বতীয় প্রভাব আছে কি না এবং কালাগোলের সন্নিকটে গন্ধর্ব্ব টিলা, গন্ধর্ব্বী ছড়া ইত্যাদি তিব্বতীয়গণের এদেশে আগমনের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে কি না বিবেচ্য।

গুহকের তিন পুত্র লড্ডুক, গুড়ক, জয়ন্তক মধ্যে রাজ্য (খণ্ড কামরূপ) বিভক্ত হয়। লড্ডুকের অধিকৃত ভূমি লাউড়, গুড়কের অধিকৃত ভূমি গৌড়, ও জয়ন্তকের অধিকৃত ভূমি জয়ন্তিয়া নাম প্রাপ্ত হয়। মধ্যম গুড়ক মূল রাজধানীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

লাউড়ে লড্ডুকের পর তৎপুত্র শম্বুক পরবর্ত্তী কালে ঐ বংশীয় আদিত্য, দেবদত্ত, ভগদত্ত (লাউড়ের পাহাড়ে, ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলে ভগদত্তের বাড়ী বলিয়া যে সকল স্থান কথিত হয় তাহাই সম্ভবতঃ ঐ লাউড় রাজা ভগদত্তের বাড়ী) ভগদত্তের পর নবার্জ্জুন, মাধব, প্রমর্দ্দন (প্রমর্দ্দন রাজা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাউড়ে রাজত্ব করেন তিনি গৌড় রাজা ক্ষেত্রপালের সম সাময়িক ছিলেন)। প্রমর্দ্দন রাজার সঙ্গে সঙ্গে লাউড়ে কুষক বংশীয় বা গৌড়বংশীয়গণের অবসান। তৎপর আচার্য্য বংশীয় অরুণাচার্য্য তৎপর বিজয় মাণিক্য। পরবর্ত্তী কালে রঙ্গ মাণিক্য, দিব্যসিংহ ইত্যাদি লাউড়ে রাজত্ব করেন।

জয়ন্তিয়াতে জয়ন্তকের পর জয়মল্ল পরবর্ত্তী কালে মহাবল, বাঙ্কাঙ্ক, রঙ্গবীর, কামদেব (সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে), ভীমবল পর্য্যন্ত গৌড়বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। তৎপর রাজপুরোহিত বংশীয় কেদারেশ্বর প্রভৃতি পাঁচজন রাজা তৎপর অজ্ঞাতকুলশীল দৈব রাজা তৎপর জয়ন্তিয়া পার্ব্বত্য রাজাগণের অধিকারে আসে। [সম্ভবতঃ ঐ সকল পার্ব্বত্য রাজাগণের প্রথম রাজাই পর্ব্বত রায়] এইভাবে ভীমবল পর্য্যন্ত (অনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে) গৌড় বংশীয়গণ জয়ন্তিয়াতে রাজত্ব করেন।

গুহকের মধ্যম পুত্র গুড়ক গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি মধুকৈটভারি স্থাপন করেন। গুড়কের পর তৎপুত্র শ্রীহস্ত রাজা হয়েন। শ্রীহস্ত ত্রিপুরার হরিরায়ের কন্যা বিবাহ করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত শাখাসাগরে একটী বন্ধনের সৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ ঐ বন্ধনের স্থান উচাইল (উচা আইল)। ঐ বন্ধন পর্য্যন্ত শাখা সাগর শ্রীচন্দল [শ্রীহস্তের চন্দল] আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শ্রীহস্ত রাজা প্রয়াগস্থ অক্ষয়

বটমুল হইতে বটেশ্বর শিব আনয়ন ক্রমে নিজ রাজধানীতে শীলাহট্টের দক্ষিণদ্বারে জটীয়া বটের তলে হট্টনাথ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। হট্টনাথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হট্টকালীর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শ্রীহস্তের পর তৎপুত্র কীর্ত্তিপাল বা কীর্ত্তিবাস তৎপর চারি পুরুষের নাম জানা যায় না (ভুতরাজ্য), তৎপর ভুতবিক্রবন্তদেব রাজা হয়েন। তিনি নির্ব্বাক ছিলেন (দেবাধিষ্টিত দেহ অভিমানে তিনি দেব উপাধি গ্রহণ করেন)। তৎপর অনন্ত দেব বা নবগীর্ব্বন্ত (পিতার ন্যায় নির্ব্বাক না হইয়া বাক্ শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় নবীন গীর্ব্বন্ত বা নবগীর্ব্বন্ত)। নবগীর্ব্বন্তের পর তৎপুত্র গোকুল কিশোর তৎপর তৎপুত্র নবনারায়ণ তৎপর তৎপুত্র গোবিন্দরণকেশব দেব। গোবিন্দরণকেশব দেব (উত্তর প্রদেশে – কুচুনীয়া দেশ ইত্যাদিতে) দিগ্বিজয় করেন। কুচুনিয়া দেশের রাজা উরঙ্গ মর্দ্দনের কন্যা চন্দনাকে যথা শাস্ত্র ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। গোবিন্দরণকেশব দেব হট্টনাথের শান্তি যজ্ঞ, তুলা পুরুষ, গোসহস্র দান যজ্ঞ, কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির (শ্রীহট্টের মনারায়ের টীলার পশ্চিমের ডাক্তার সাহেবের টীলার উপর) প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার সময়ে বিদেশীয় বহু ব্রাহ্মণ এদেশবাসী হয়েন। ঐ সময়ে পঞ্চ গোত্রীয় তথা দশ গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণগণ এদেশে আগমন করেন। গৌড় পঞ্চ দেবতার যথা গ্রীবাপীঠ, হট্টনাথ, হট্টকালী, কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারির, সেবক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় "গোবিন্দী" ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

গোবিন্দরণকেশবের পর তাঁহার প্রথম পুত্র যাদবদেব রাজা হয়েন। যাদব দেব অপুত্রক ছিলেন তৎপর যাদবের জীবনকালেই গোবিন্দরণকেশবের দ্বিতীয় পুত্র কংস নারায়ণ রাজা হয়েন। কংস নারায়ণ পিতার নামে কেশবায়সত্র ও মাতার নামে কমলা সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। (কালাগোল মৌজায় জঙ্গলমধ্যে কমলা দিঘী নামে একটি প্রাচীন দিঘী দৃষ্ট হয়)। কংস নারায়ণ যৌবনে পরলোকগত হয়েন। তৎপর তাঁহার রাণী কলাবতী নাবালক পুত্র প্রবীরের পক্ষে রাজত্ব করেন। তৎকালে গোন্দিরণকেশবের অন্য একজন পুত্র (চন্দনা গর্ভজাত) কলাবতীর সহকারী রাজা ছিলেন, ঐ সময় মধুকৈটভারির মন্দির শ্রীহট্টের মনারায়ের টীলার পূর্ব্বদিকস্থ বর্ত্তমান মানিকপীরের টিলার উপর প্রতিষ্টিত হয়। (ভাটেরার প্রাপ্ত তাম্রফলকে নবগীর্ব্বান, গোকুল, নারায়ণ, কেশব ও ঈশানের নাম পাওয়া যায় মাত্র)।

প্রবীর বয়োপ্রাপ্ত হইলে, রাজা হয়েন। তৎপর তাঁহার পুত্র ভুজবীর বা রাজা ভুজা গৌড়ে রাজত্ব করেন। ভুজবীরের সময় সায়রের দক্ষিণতীরবর্ত্তী দক্ষিণ গৌড়ের প্রজাগণের সুবিধার জন্য ভাটেরায় (ভাটসৈন্যের এড়া দুর্গ) দুর্গ ও বিচার-মঞ্চ স্থাপন করা হয়।

ভুজবীরের পর তৎপুত্র ক্ষেত্রপাল। ক্ষেত্রপাল রাজার সময় বরাক হইতে একটা খাল কাটাইয়া, অন্যান্য পার্ব্বত্য ছড়া নদীর সংযোগে সুরমা নদীর সৃষ্টি করা হয়।

ঐ সকল সময়ে বরাক ও সুরমা—বাহিত পলিমাটীদ্বারা শ্রীচত্বল সাগরাংশে বিভিন্ন স্থানে চর সকলের উদ্ভব হয়। এই ভরাট ক্রিয়া অবশ্য কয়েক শতাব্দী যাবৎ চলিতেছিল। শ্রীহস্ত রাজার কৃত বাঁধ ও সম্ভবতঃ ইহাতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে। ঐ সময় ও পরবর্ত্তী কালের রাজাগণের (ধর্ম্মধ্বজ, ভবানন্দ, গৌড়-গোবিন্দ প্রভৃতির) চেষ্টায় নবোত্থিত বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী গভীরাংশ (হাওর বা বিল) সকল পরস্পর যোগ সাধন করায় শ্রীচত্বল জুড়িয়া বহু স্রোতের (রত্না স্রোতের) সঞ্চারে শ্রীচত্বল ক্রমাগত ভরাট হইয়া পড়ে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শ্রীহট্টের বিস্তৃত সমতক্ষেত্র জুড়িয়া বিভিন্নস্থানে আকাবাকা রত্না নদীর এবং ভরাঙ্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়।—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উচাইল হাসাগাড়া পর্য্যন্ত গৌড়গোবিন্দের রাজ্যের সীমা ছিল বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে।

ক্ষেত্রপাল রাজার দুই পুত্র ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ মধ্যে গৌড় রাজ্য বিভক্ত হইল (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে)। ব্রহ্মজিৎ ব্রহ্মচাল অঞ্চলে নূতন রাজধানী করেন। ব্রহ্মাঞ্চলে ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ একটী বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (সম্ভবতঃ ভাটেরা হোমের টিলায়)। ঐ যজ্ঞে—নিধিপতি বাৎস্য হোতা ছিলেন। নিধিপতির পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দরণকেশবের সময় এদেশবাসী হন। তাহার পিতামহ পুনর্ব্বার মিথিলাবাসী হয়েন। পিতা রুদ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে নিধিপতি মাতুলের আশ্রয়ে কাশীধামে পাঠ সমাপন করিয়া মিথিলা রাজদ্বারে পাণ্ডিত্য দেখাইয়া অবস্থিতি করেন। পরিণত বয়সে পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং ক্রমে শ্রীহট্টে উপনীত হইলেন। ঐ যজ্ঞ হট্টনাথের বর্ণবিপর্য্যয়ের প্রতিকার ও নূতন রাজধানীর পবিত্রতা সাধনের জন্য হইয়াছিল। যজ্ঞান্তে ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ নিধিপতিকে

দক্ষিণ গৌড়ের অন্তর্গত এক বৃহৎ ভুখণ্ড প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিধিপতিদ্বিজ উক্ত ভুমির মধ্য রেখা আবিষ্কার ক্রমে ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইড়া প্রবাহিত হয় সেইকালে যতদূর তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, দীর্ঘে প্রস্থে সেই পরিমাণে ভূমি পরিমাপ ক্রমে নিজ ইষ্ট ভূমি চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন। নিধিপতিদ্বিজের ঐ ইষ্টাভূমিই ইটা ভুমি। ব্রহ্মজিৎ ধর্ম্মধ্বজ বৈমাত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সমসাময়িক পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ধর্ম্মধর কিছুকাল পরে রাজবাস্তর বাহিরে অরণ্য প্রদেশে একটী বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞেও নিধিপতি দ্বিজ হোতা ছিলেন।

নিধিপতি দ্বিজ ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধর হইতে উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী বিরোধীয় ভূমি (বালিশীরা প্রভৃতি অঞ্চল) ব্রহ্মোত্তররূপে প্রাপ্ত হয়েন।—ইহাতে ধর্ম্মধ্বজের সম্মতি ছিল (ধর্ম্মধ্বজের সহিত ত্রিপুর রাজার মিত্রতা ছিল,) কিন্তু ব্রহ্মজিৎ ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। গৌড়রাজ্য বিভক্ত হইলে ব্রহ্মজিৎ দক্ষিণ গৌড়ের অধিকারী হয়েন। ব্রহ্মজিতের নামে তাহার রাজধানীর নাম ব্রহ্মাঞ্চল তথা ব্রহ্মাঞ্চল রাজ্য। কনিষ্ট ধর্ম্মধ্বজ উত্তর গৌড় বা পাট গৌড়ে রহিয়া গেলেন। ব্রহ্মজিৎ নিজ রাজধানীতে (ভাটেরা ব্রহ্মাঞ্চলে) গ্রীবাপীঠ ব্যতীত গৌড় পঞ্চদেবতার বাকী চারিজনের যথা—হট্টনাথ, হট্টকালী, কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারির প্রতিনিধি দেবতা স্থাপন করেন।—ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজের সময় হইতেই পরবর্ত্তী ক্রমে উভয় শাখার মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল।

ব্রহ্মাঞ্চল শাখায় ব্রহ্মজিতের পর তৎপুত্র ইন্দুজিৎ তৎপর ইন্দুজিতের পুত্র জয়ানন্দ। জয়ানন্দের দুই পুত্র শ্রীনন্দ ও উপানন্দ। কনিষ্ঠ উপানন্দ সেনাপতি অমরসিংহের যোগতায় জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত ক্রমে কৌশলে রাজ্যাধিকারী হয়েন। শ্রীনন্দ, স্ত্রী অন্নপূর্ণা ও বালক পুত্র গোবিন্দকে রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পাটগৌড়শাখায় ধর্ম্মধ্বজের পর তৎপুত্র রাজধ্বজ বা রাজুড়া তৎপর তৎপুত্র গৌড়ধ্বজ বা ভবানন্দ (ষোলদ্বিপ যাহার পাত্র), ভবানন্দের পর তৎপুত্র গঙ্গাধ্বজ বা গোবর্দ্ধন গৌড়ে রাজত্ব করেন।

গৌড়রাজা গোবর্দ্ধনের কৌশলে ব্রহ্মাঞ্চলের সেনাপতি অমরসিংহের যোগতায় ত্রিপুর সীমান্তরক্ষী সর্দ্দারগণ রাত্রিতে ব্রহ্মাঞ্চল রাজধানী ধ্বংস করে। কুমার গোবিন্দ দ্বাদশজন অমাত্য পুত্র সহ রাত্রিতে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া

প্রাণ রক্ষা করে। গুরু গিরিধারী নামক একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী (যাহার মিথিলা, পাণ্ডুয়া, কুলসিয়া, কলাবতী প্রভৃতি স্থানে আশ্রম ছিল) তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন। গিরিধারী সন্ন্যাসী বালকগণকে সন্ন্যাসীবেশে নানাস্থানে রাখিয়া দ্বাদশবর্ষ ক্ষত্রোচিত রণশিক্ষা প্রদান করেন।

ব্রহ্মাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার পর সেনাপতি অমরসিংহ ব্রহ্মাঞ্চলের রাজা হয়েন। পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরী সর্দ্দারগণের কাহিনী ও অমরসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিয়া ত্রিপুররাজা রতনমাণিক্য ব্রহ্মাঞ্চল আক্রমণ করেন। এদিকে গৌড়রাজা গোবর্দ্ধন পুর্ব্বোত্তর অঞ্চলীয় পার্ব্বত্য রাজাগণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অমরসিংহ যুদ্ধে নিহত হন। রত্তনমাণিক্য অমরসিংহের স্ত্রী চন্দ্রকলাকে রাজধানীর নিকটে খণ্ডভূমি মহাত্রাণ স্বরূপ প্রদান করেন। (ব্রহ্মচালের পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকলা বলিয়া একটা স্থান, চন্দ্রকলার দাড়া ইত্যাদি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়)। ব্রহ্মাঞ্চলে একজন সামন্ত রাজার সৃষ্টি হইল।

এদিকে গৌড়রাজা গোবর্দ্ধন পূর্ব্বোত্তরঞ্চলীয় পার্ব্বত্য রাজাগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। পার্ব্বত্যগণ গৌড়রাজধানী আক্রমণ করিল। সমকালেই ঐ সংবাদ পাইয়া গুরু-গিরিধারী গোবিন্দ ও তাহার অনুষঙ্গীগণ ও করোতয়া তীরবর্ত্তী রাজ্যহারা রাজকুমার নারায়ণ (আচাক নারায়ণ) সহ গৌড়ে উপস্থিত হন। কুমার গোবিন্দ প্রভৃতির বীরত্বে পার্ব্বত্যগণ পরাজিত হয়।

সেই সময় গৌড় রাজা গোবর্দ্ধনের পুত্র গরুড়ধ্বজ বা গড়ুল বালক মাত্র। গিরিধারী সন্ন্যাসী গোবিন্দ প্রভৃতির পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। রাণী অপর্ণা (গোবর্দ্ধনের স্ত্রী ও গোবিন্দের খুড়ী মাতা) ও গৌড়ীয় অমাত্যগণের সম্মতিতে গোবিন্দ গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। গরুড় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এইভাবে গৌড় বংশীয় (ব্রহ্মাঞ্চল শাখার) গোবিন্দ গৌড়ের রাজা হইলেন। দুই রাজ্যের দুই অধিকারী গরুড় ও গোবিন্দ মিলিয়া গরুড় গোবিন্দ যুক্ত নামের সৃষ্টি হইল। গোবিন্দ পৈত্রিক ব্রহ্মাঞ্চল রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মাঞ্চল গৌড়ের অধীনে সামন্ত রাজ্য হইল।

তুঙ্গনাথাঞ্চল বা তরপের ক্ষুদ্র রাজ্য গৌড় ও ত্রিপুরা এই উভয় রাজ্যের প্রভাবে সময় সময় থাকিত। তরপের মৃত রাজা এপবিষ্ণুর কন্যা লালসাকে

নারায়ণ (আচাক নারায়ণ) বিবাহ ক্রমে সেই রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আচাক নারায়ণের ভগ্নী হীরাবতীকে গোবিন্দ বিবাহ করেন।

গোবিন্দ (গৌড়গোবিন্দ বা গরুড় গোবিন্দ) রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার গড় যথা গড়দ্বার (সদর গড়), ভাটেরাতে গড়, টিলাগড়, পেচগড় বা পেচাগড় (সহরের কয়েক মাইল উত্তর পূর্ব্বে) রায়গড় (স্থায়ী গড়) গ্রাম্যগড় বা গয়গড় (অস্থায়ী সৈন্যাবাস, সে স্থলে শস্ত্রধারীগণ থাকিত) করেন। শ্রীহট্ট জিলার বহু স্থানে রায়গড়, গড়গ্রাম, গয়গড় ইত্যাদি আছে। বহু স্থানে সেনাপতিগণের বাস সেনাপতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ঐ সকল গড়ের অধিনায়ক ছিলেন। নৌ-সৈন্য পরিচয় করিবার জন্য টিকার গড় (হুলালীতে)এবং শ্রীচত্বল মধ্যে পুনি বিল ইত্যাদি স্থানসকলে নৌকাগড় অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ ডিঙ্গাকে জলদুর্গ রূপে ব্যবহার করেন। গৌড়ের প্রধান নবডিঙ্গা—হাকালুকা, চালি, জিল্কার, হালি (হাইল), চাতালি (চাতল) মকরমুখী বা মাকরস্থা (মাকরসি) দামুড়িয়া (দামড়ি), বরুয়াবাড়ল। ঐ সকল ডিঙ্গা যে সকল সাগরাংশে (হাওরে বা বিলে) সাধারণতঃ থাকিত সেই সকল সাগরাংশ ঐ প্রকার নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গৌড়গোবিন্দ রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার শৃঙ্খলা সাধন করেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন মনা রায়। মন্ত্রীভবনের টীলায়—সাবেক চৌতল অট্টালিকাকে তিনি সপ্ততলে পরিণত করেন। মন্ত্রীর নামে মন্ত্রীর টিলা অর্থাৎ মনারায়ের টিলাতেই সপ্ততল ছিল।

রাজমাতা অপর্ণার দীঘি প্রতিষ্ঠা কালে গড়ুয়া অর্থাৎ রবাহুত ব্রাহ্মণগণ হাঙ্গামা করিয়াছিল, উক্ত হাঙ্গামায় অনেক গড়ুয়া ব্রাহ্মণ উপবীত ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। যদিও রাজা গৌড়গোবিন্দ তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্য ইত্যাদি করাইয়া উপবীত সংস্কার করাইয়া দেন তবুও তাঁহারা ব্রাহ্মণ সমাজে হেয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একটি পৃথক সমাজের সৃষ্টি হইল। ইহারাই গড়গোবিন্দা বা গৌড়গোবিন্দী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। রাজমাতা অপর্ণার (গরুড়ের মাতা ও গোবিন্দের খুড়ীমাতা) প্রতিষ্ঠিত "রাজার মার" দীঘি অদ্যাপিও শ্রীহট্ট আম্বরখানায় দৃষ্ট হয়।

গরুড়ধ্বজ শ্রীহট্টের মগধ রাজ্যের রাজা কণক সিংহের কন্যা শান্তিপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। এবং যৌতুকস্বরূপ চাপঘাট (ধনু বিক্রয়ের ঘাট) প্রাপ্ত হয়েন। কণকসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী ছত্রসিংহ পশ্চিমের মগধ হইতে (নিজরাজ্য শত্রু কবলিত

হওয়ায়) এদেশে আগমন করেন। তিনি গৌড়বংশীয় ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজের এবং তাঁহাদের সমকালীন ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধরের সহায়তায় উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন। ছত্রসিংহের নামানুসারেই ছত্রচূড়া পর্ব্বতের নাম। কণক সিংহের দুই পুত্র প্রতাপ সিংহ ও জগত সিংহ। সম্ভবতঃ প্রতাপগড় ও জগৎ সিংহের গড় তাঁহাদের নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র।

গৌড়েশ্বর গোবিন্দ একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি লষ্করে ব্যায়ামের স্থলে (লাক্করথলায়) নানা প্রকার ব্যায়ামের প্রচলন করেন। রাজ্যের নানাবিধ উন্নতি ও শৃঙ্খলা সাধন করেন। তাঁহার রাজ্যকালে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও মহাত্রাণ ভাগী ব্রাহ্মণ ও ভদ্র সম্প্রদায় অতি সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। গৌড়গোবিন্দের সময় শীলাহট্টের ত্রিপক্ষব্যাপী বাসন্তী মেলা এবং গৌড়ের কবচবদ্ধ পঞ্চ দেবতার (গ্রীবাপীঠ, হট্টনাথ, হট্টকালী, কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারির) যথাক্রমে মহা বিষুব সংক্রান্তি, শিবচতুর্দ্দশী, মহাষ্টমী, জন্মাষ্টমী ও উত্থান একাদশী এই পঞ্চদিনে মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত। গঙ্গাতীরবাসী ভিষক্ প্রবর চক্রপাণি দত্ত গৌড়গোবিন্দের রাজত্বকালে শ্রীহট্টে আগমন করেন।

গৌড়গোবিন্দ একাধিক বার মুসলমান আক্রমণ ব্যর্থ করেন। শেষ আক্রমণের কালে পাটস্থানে হট্টনাথ অদৃশ্য হওয়ায় ও পীঠস্থানে হাটকেশ্বর বিদারিত হওয়ায় ও প্রায় সমকালেই রাজপ্রেরিত লৌহধনুতে (ঐ বৃহৎ ধনু রাজপূজিত, ইহা মধুকৈটভারির মন্দিরে থাকিত) নসিরুদ্দিন গুণ দিতে সক্ষম হইলে, দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া রাজা অরণ্যে প্রবেশ করেন। যুবরাজ গড়ুল (তৎপূর্ব্বেই খঞ্জদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), রাজমাতা অপর্ণা ও শান্তিকে লইয়া ভৃত্য ঝাটুরাম গোপনে ধানুহাটার ঘাট হইতে নৌকায় তরপের দিকে পলায়ন করে। পুনি বিলের সন্নিকটে কয়েকজন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গরুড় রাজা নৌকা হইতে পড়িয়া পুনি বিলে প্রাণত্যাগ করেন। রাজমাতা অপর্ণা ও শান্তিকে নিয়া ঝাটুরাম কোন প্রকারে পলায়ন করে।—এইভাবে শ্রীহট্টে গৌড়বংশের অবসান ঘটিল। মুসলমান সেনাপতি সিকন্দর গাজী গৌড় অধিকার করিলেন। গৌড়ের অনেক জিনিষ বিনষ্ট হইল। মহাপীঠ প্রতিভা সংক্ষোচক্রমে সাধারণ্যে অপ্রকাশিত হইয়া পড়িলেন। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের অন্তর্ধানের প্রায় শতবর্ষ পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৩০২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীহট্টেও একটি ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

কৃষকবংশ বা শ্রীহট্টের গৌড় রাজবংশ।

পরীক্ষিৎ = রক্ষিতা — (১) কামসিন্ধু = উর্ম্মি ১ (ক)

তিব্বতীয় হাটকনগরের যুবরাজ কৃষক (২) = উর্ব্বরা

(৩) হাটক = সমৃদ্ধি

(৪) গুহক = প্রকৃতি

লড্ডুক = সিদ্ধেশ্বরী (লাউড়পতি) (পরে দেওয়া যাইবে)

(৫) গুড়ক = যোগমায়া (গৌড়পতি)

জয়ন্তক = মেধাবতী (জয়ন্তিয়াপতি) (পরে দেওয়া যাইবে)

শীলা

চটলা (চট্টলরাজ্য)

(৬) শ্রীহস্ত = অরুন্ধতী

(৭) কীর্ত্তিপাল

(৮) নাম জানা নাই

(৯) ঐ

(১০) ঐ

(১১) ঐ

(১২) ভুতবিক্রবন্তদেব

(১৩) অনন্তদেব বা নবগীর্ব্বান্ত

(১৪) গোকুলকিশোর

(১৫) নবনারায়ণ = ভদ্রাবতী

(১৬) গোবিন্দ রণকেশব = সুনন্দা, কমলা, চন্দনা

১৭ যাদব — ১৭ (ক) কংসনারায়ণ — কলাবতী — ১৭(খ) চন্দনাপুত্র (কলাবতীর সহকারী রাজা) — পুত্র — ৫ কন্যা

(১৮) প্রবীর

ভাটেরার ফলকের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠোদ্ধার মতে—

নবগীর্ব্বান

গোকুল

নারায়ণ

গোবিন্দকেশব

পুত্র — পুত্র — ঈশান

(১৮) প্রবীর

(১৯) ভুজবীর

(২০) ক্ষেত্রপাল=সুরম্যা, রত্নাবতী

২১ (ক) ব্রহ্মজিৎ (দক্ষিণগৌড় রাজধানী ব্রহ্মাচল)

২২ (ক) ইন্দ্রজিৎ

২৩ (ক) জয়ানন্দ

শ্রীনন্দ=অন্নপূর্ণা ২৪(ক) উপানন্দ

(২৫) গৌড়গোবিন্দ (শেষ রাজা)=হীরাবতী

শ্রীমতী ভানুমতী নির্ব্বান

২১(খ) ধর্ম্মধ্বজ (পাটগৌড়)

২২(খ) রাজধ্বজ বা রাজুড়া

২৩(খ) গৌড়ধ্বজ বা ভবানন্দ

২৪(খ) গঙ্গাধ্বজ বা গোবর্দ্ধন=অপর্ণা

গরুড়ধ্বজ=শান্তিপ্রিয়া
(শেষ যুবরাজ)

গৌড়গোবিন্দ এবং গরুড়ধ্বজের সময়ে উভয় শাখার মিলন হয়। রাজধানী পাটগৌড় বা শ্রীহট্টে ছিল।

শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে আমরা শ্রীহট্টের হিন্দু রাজত্ব অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসকে লক্ষ্য করিতেছি। এ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজত্বকালের (১) নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপি সকল (২) ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয় (৩) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উল্লেখিত জগন্নাথপুরে প্রাপ্ত বিজয়মাণিক্য রাজার ১১১৩ শক অর্থাৎ ১১৯১ খৃঃ একটী প্রাচীন মুদ্রা—এই তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। নিধনপুরের তাম্রলিপিসকলের সহিত শ্রীহট্টের কোন সম্পর্ক বিশেষ নাই। ইহা দ্বারা কামরূপপতি ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করার উক্তি আছে। দানকৃত ভূম্যাদি শ্রীহট্টের নহে, রাজাও শ্রীহট্টের নহেন। সম্ভবতঃ দানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের পরবর্ত্তীগণের সঙ্গে কি অন্য কোন কারণে তাম্রফলক সকল এদেশে আসে। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ৺পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কামরূপশাসনাবলীতে আছে)। ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রফলকের সহিত ও উপরোক্ত মুদ্রার সহিত "৺গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ" পুস্তিকার ভিত্তি হট্টনাথের পাঁচালীর নষ্টোদ্ধারের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। আমরা ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রফলকের সহিত "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশের" যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তৎপর অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা করা যাইবে। ঐ সকল আলোচনা দ্বারা হট্টনাথের পাঁচালীর নষ্টোদ্ধারের ঐতিহাসিক সত্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা অপ্রত্যক্ষভাবে কতকটা প্রমাণিত হইবে বলিয়া মনে করি।

আমরা সর্ব্বপ্রথমেই সংক্ষেপে শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কতটুকু আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিব। প্রায় ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৯ বাংলায় দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার ভাটেরা নামক স্থানে একটি টিলাতে দুইখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়। তাম্রফলক যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানের নামেই তাম্রফলককে পরিচিত করিবার একটি রীতি আছে। ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রফলক ভাটেরার তাম্রফলক নামে এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয়।

ভাটেরায় প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রলিপিতে মোটামুটি নবগীর্ব্বান্ তৎপুত্র গোকুল দেব তৎপুত্র নারায়ণ দেব তৎপুত্র গোবিন্দ কেশব দেব, তৎপুত্র ঈশান দেব এই পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রথম লিপিতে গোবিন্দ কেশব দেব বটেশ্বর (হট্টনাথ) শিবকে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৮ খানা বাড়ী দান করিতেছেন। দ্বিতীয় লিপি দ্বারা ঈশান দেব মধুকৈটভারির নামে ২ হাল ভূমি দান করিতেছেন। তাম্রফলকে গোবিন্দ কেশব দেব কর্ত্তৃক কংসনিসূদনের আকাশস্পর্শী মেঘবিদারী উচ্চচূড় প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণের কথা ও গোবিন্দ কেশব দেবের তুলাপুরুষ দান এবং ঈশান দেব কর্ত্তৃক মধুকৈটভারির জন্য অভ্রভেদী এক মন্দির নির্ম্মাণের উক্তি আছে। তাম্রফলকোক্ত বটেশ্বর শিব, কংসনিসূদনের উচ্চচূড় প্রস্তর মন্দির এবং মধুকৈটভারির সুউচ্চ মন্দির তথা পূর্ব্বোক্ত রাজাগণের রাজধানী যে কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে তাম্রফলকদ্বয় নীরব।

১৯০৫।১৯০৬ ইং B. C. Allen, E. A. Gait ইতিহাস লিখেন। তৎপর শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ঐ সকল পুস্তক পর্য্যালোচনায় শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই মাত্র জানা যায় যে উত্তর শ্রীহট্ট বা গৌড়ে একটি হিন্দুরাজ্য ছিল। রাজাগণের বংশ বা অন্যান্য বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাঁহাদের রাজধানী গৌড়ের নামেই তাঁহাদের অধিকৃত স্থান গৌড় বলিয়া অভিহিত হইত। সর্ব্বশেষ রাজার নাম গৌড়গোবিন্দ। যাদুবিদ্যায় তিনি সপ্ততল অট্টালিকা করেন। গৌড়গোবিন্দের পতন ঘটে শাহজলাল দ্বারা ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে। [ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি ফলক লিপি যাহা মিঃ ষ্টেপলটন ১৯১৩ ইং আগষ্ট মাসে ঢাকা রিভিউতে প্রকাশ করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে শ্রীহট্টের মুসলমান বিজয় ঘটে ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খৃষ্টাব্দে।]

তাম্রফলক দুইখানি (যাহাকে শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্ট ইতিহাসের একটী ছিন্ন পৃষ্ঠা আখ্যা দিয়াছেন) ভাটেরাতে প্রাপ্ত হওয়ায় তাম্রফলকের রাজাগণের রাজধানী নিশ্চয়ই ভাটেরাতে ছিল এবং রাজধানী ভাটেরাতে হইলে তাম্রফলকোক্ত বটেশ্বর (হট্টনাথ), কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির ও মধুকৈটভারির সুউচ্চ মন্দিরও নিশ্চয় ভাটেরাতে ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান

করিয়াছিলেন। তাম্রফলকে যখন দেখা গেল যে বটেশ্বরের স্থান হট্টপাটক তখন নিশ্চয়ই রাজাগণের রাজধানীর নাম হট্টপাটক ছিল গতিকে ভাটেরারই প্রাচীন নাম হট্টপাটক এই প্রকার অনুমানও কেহ কেহ করিয়াছিলেন। সেইভাবে ভাটেরা রেল ষ্টেশনের হট্টপাটক নাম করার চেষ্টা করা হইল, (অবশ্য রেল কোম্পানী করিয়াছেন ভট্টপাটক)। কেহবা বটেশ্বরের স্থানকে হট্টপাট বলিয়া তাম্রফলকে যে উক্তি এবং তাম্রফলক ভাটেরাতে প্রাপ্তি ইহার মধ্যে একটী সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য বটেশ্বর হইতে বটেহর এবং বটেহর হইতেই ভাটেরা নামের উৎপত্তি, (৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) কেহবা রাজাগণকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া তাম্রফলকে উক্ত দেখিয়া ইহারা কাছাড়ের হিড়িম্বা বংশীয় (Gait's History of Assam) কেহবা ত্রিপুরা রাজবংশের কোন অজ্ঞাত শাখাসম্ভূত ইত্যাদি অনুমানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজমালাতে এই প্রকার উক্তি দেখা যায় না। তবে পূর্ব্বোক্ত অনুমান সকলকে ভিত্তি ক্রমে যদি কোন আধুনিক ত্রিপুর রাজমালা প্রকাশক এই প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন তবে তাহার মূল্য কতটুকু ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশের পর শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষভাবে ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্র ফলকদ্বয় সম্বন্ধে ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় গবেষনা করেন। ডাঃ গুপ্ত ১৯৩৬-৩৭ ইংরেজীর প্রতিভা দেবী স্মৃতি বক্তৃতা করেন। ঐ তিনটী বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীহট্টের হিন্দুরাজ্য সকল"। তৎপর আমরা "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ" প্রকাশ করি। ডাঃ গুপ্ত হট্টনাথের পাচালী দ্বারা শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্ধকার যুগ সকলে প্রচুর আলোক পাতের সম্ভাবনা এবং ইহাকে ভাটেরার তাম্রফলকদ্বয়ও সমর্থন করিতেছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"গ্রীবা পীঠের পুনঃ প্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ" পুস্তিকাতে গাবিন্দকেশবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে আমরা অনুমানিক খৃঃ ১১শ শতাব্দী বলিয়া একটী উক্তি করিয়াছিলাম। গোবিন্দ কেশবদেব ভাটেরার প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেহ কেহ বলিতেছেন শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবুর মতে ইহা (ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রলিপি) খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দার

মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পাঠোদ্ধার মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর এবং ডাঃ মিত্রের ভ্রম ইতিবৃত্তকার বিশদভাবে দর্শাইয়াছেন কিন্তু কেহই তাম্রফলককে আমাদের ন্যায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলেন নাই।

ধরিয়া লওয়া গেল ডাঃ মিত্র অনবধানতা বশতঃ তাড়াতাড়িতে অব্দ নির্ণয়ে ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন (অব্দ নির্ণয়ের চারিটী সংখ্যা মধ্যে প্রথম দুইটী বিশেষ স্পষ্ট না থাকায়)। তবে পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অনুমান ও শ্রীযুক্ত অচ্যুৎ বাবুর অনুমান মধ্যেও প্রায় ছয়শত বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রকাশের পর ভাটেরার তাম্রফলক লইয়া আরো গবেষণা হইয়াছে এবং ভাটেরায় প্রাপ্ত ১ম তাম্রফলক যাহা দ্বারা গোবিন্দরণকেশবদেব বটেশ্বর (হট্টনাথ) শিবকে ভূমি দান করেন তাহা ১০৪৯ খৃঃর নিকটবর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে (Ephigraphia Indica XIX 280 lines 5 & 29, Indian Historical Quarterly for Dec, 1931)। ভাটেরার তাম্র-ফলক যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী সময়ের হইবে তাহার দুইটী আনুষঙ্গিক প্রমাণ আমরা দিতেছি।

(১) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সুপণ্ডিত ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাম্রফলকের অক্ষরের নমুনা পর্য্যালোচনায় ইহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর হইবে বলিয়া অনুমান করেন। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খঃ ৩৭ পৃষ্ঠা) (২) ৺ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থে তাম্রফলকের ভাব ও ভাষা অন্যান্য (কামরূপের) তাম্র লিপির ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা মূলক আলোচনা দ্বারা অনুমান করিয়াছিলেন যে তাম্রফলক খৃষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীর হইবে।

উপোরক্ত দুইপ্রকার আনুষঙ্গীক নির্ভরযোগ্য প্রমাণের মূল্য (যদিও স্থূল) ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অপিচ তাম্রফলকে শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলা-ত্মক বিষয় এবং তুলাপুরুষের উক্তিতে ইহা যে পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তীকালের তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়। সুতরাং ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন যাহা প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর তাহাকে যদি খৃষ্ট পুর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ধরিয়া লইয়া বিতর্ক করা হয়—তবে গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশে গোবিন্দরণকেশবের রাজত্ব

কালের (খৃঃ ১১শ শতাব্দীর) সহিত অসামঞ্জস্যই হইবে কারণ এস্থলে সামঞ্জস্য হওয়া অস্বাভাবিক।

ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রলিপি ১০৪৯ খৃঃ নিকটবর্ত্তী সময়ের। উক্ত তাম্রলিপির পরবর্ত্তী কালেই যে গোবিন্দরণকেশবদেব কর্ত্তৃক কংসনিসূদনের প্রস্তরমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা উভয় লিপি পাঠে বুঝা যায়। কারণ গোবিন্দ-রণকেশবদেবের প্রথম তাম্রশাসনে উক্ত মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই। প্রথম তাম্রশাসন পাঠে ইহাই অনুমান করা যায় যে রাজা প্রথম জীবনে দিগ্বিজয় সাধন করার পরই বটেশ্বর (হট্টনাথ) শিবকে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ী দান করেন। দ্বিতীয় ফলকে (যাহা তাহার পুত্র ঈশান দেবের কালের), গোবিন্দরণকেশব কর্ত্তৃক কংসনিসূদনের প্রস্তরমন্দির নির্ম্মানের উক্তি আছে। গতিকে কংসনিসূদনের মন্দির নির্ম্মানকাল ১০৪৯খৃঃ পরবর্ত্তীকালের হইবে এবং আমরা "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশে" গোবিন্দরণকেশব কর্ত্তৃক কংসনিসূদনের প্রস্তরমন্দির (শ্রীহট্টে) নির্ম্মাণের যে অনুমানিক কাল অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহার সহিত ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রফলকদ্বয়ের সম্পূর্ণ মিলই আছে। কোনপ্রকার অসামঞ্জস্যই দেখা যাইতেছে না। অধিকন্তু ইহা গৌড়-গোবিন্দের কালের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভাটেরার তাম্রফলকদ্বয় পাঠে কেশব দেবের সম্পূর্ণ নাম গোবিন্দ কেশব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ গুপ্ত ডাঃ মিত্রের সহিত এক মত। আমরা "গ্রীবা পীঠের পুনঃ প্রকাশে" কেশব দেবের সম্পূর্ণ নাম গোবিন্দরণকেশব বলিয়া উক্তি করিয়াছি। পাঠকের সুবিধার জন্য এ স্থলে তাম্রফলকে কেশব দেবকে কি ভাবে বিশেষিত করা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। যথা "—রিপুরাজশোষী গোবিন্দ ইত্যজনি কেশব দেব এষঃ।" (প্রথম ফলক) এবং "—রিপুরাজশোষী গোবিন্দ বীরো……কেশব দেব" (দ্বিতীয় ফলক) সুতরাং উভয় তাম্র শাসনেই দেখা যায় কেশব দেবকে গোবিন্দ এবং রিপুরাজশোষী বিশেষণে বিশেষিত করা হইতেছে। তাম্রফলক পাঠে দেখা যায় কেশব দেব একজন বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি দ্বিগ্বিজয় ইত্যাদি করিয়াছিলেন। গোবিন্দ উপাধি ছাড়াও কেশব দেব অনিবার্য্য রণজয়ী থাকায়ই বোধ হয় তাহাকে রণকেশব নামে অভিহিত করা হইত এবং গোবিন্দ ও রণ উভয়ই কেশব দেবের

উপাধি থাকা সম্ভব ছিল। গতিকে হট্টনাথের পাচালীতে কেশব দেবকে গোবিন্দ রণকেশব নামে যে অভিহিত করা হইয়াছে তাহাই সম্ভাব্য। হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধারেই প্রথম গোবিন্দ রণকেশব নামের উল্লেখ। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ মিত্র কেশব দেবের সম্পূর্ণ নাম গোবিন্দ কেশব বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনা হইতে হট্টনাথের পাচালীর লিখিত কেশবদেবের সম্পূর্ণ নামের সমর্থন ও আমরা তাম্রফলকদ্বয় হইতে পাইতেছি।

ভাটেরার তাম্রফলক পাঠে এই মাত্র বুঝা যায় যে তাম্রফলকের রাজাগণের রাজধানীতে বটেশ্বর (হট্টনাথ) শিব, কংসনিসূদন মন্দির এবং মধুকৈটভারির মন্দির ছিল। কিন্তু উক্ত রাজাগণের রাজধানী যে কোথায় ছিল তাহা তাম্রফলক হইতে পাওয়া যায় না। ভাটেরাতে তাম্রফলক পাইলেই নবগীর্ব্বান্ প্রভৃতি রাজাগণের রাজধানী ভাটেরাতে ছিল এবং সেইস্থানেই বটেশ্বর (হটনাথ) শিব, কংসনিসূদন এবং মধুকৈটভারির মন্দির ছিল তাহা বলা যায় না। ভাটেরাতে না হইয়া অন্যত্র ও হইতে পারে। আমরা "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশে" ঐ সকল রাজাগণের রাজপাট শ্রীহট্টে ছিল এবং বটেশ্বর (হট্টনাথ) শিব, কংসনিসূদন এবং মধুকৈটভারির মন্দির শ্রীহট্ট সহরেই ছিল এবং ভাটেরার তাম্রফলকোক্ত উক্ত তিনজন দেবতা হট্টনাথ (বটেশ্বর) শিব, কংস-নিসূদন ও মধুকৈটভারি ব্যতীত হট্টনাথের শক্তি হট্টকালী এবং গ্রীবাপীঠ শ্রীহট্টে ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি এবং মুসলমান সেনাপতি সিকন্দর গাজী কংসনিসূদনের সুদৃঢ় প্রস্তর মন্দির (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের মনারায়ের টিলার পশ্চিমে ডাক্তার সাহেবের টিলার উপর) এবং মধুকৈটভারির মন্দির (সম্ভবতঃ মানিক পীরের টিলায়) সপ্ততল (মনারায় টীলায়), কেশবায়সত্র, গড়দ্বার, রাজভবন ইত্যাদি বিনষ্ট করেন এবং ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরাদি শাহজলালের মসজিদ ইত্যাদিতে লাগিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমানে দেখা যাউক হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধারের ঐ সকল উক্তির কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে কি?

ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্রফলক পাঠে বুঝা যায় যে কংসনিসূদনের অভ্রভেদী প্রস্তর মন্দির এবং মধুকৈটভারির উচ্চচূড় মন্দির শ্রীহট্টের মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই। কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির মুসলমান বিজয়ের ২৫০ শত বৎসর (অনুমানিক) এবং মধুকৈটভারির মন্দির মুসলমান বিজয়ের

কিঞ্চিন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাম্রফলক হইতে পাওয়া যায় যে প্রস্তরের মন্দিরটী ছিল ৺ কংসনিসূদনের—"মন্দির কংসনিসূদনস্য শিলাভিরুচ্চৈঃ" (তাম্রফলক)

শ্রীহট্টের দরগা মহল্লার মুফতি আজহর উদ্দিন সাহেব ইদানীং "শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার জন্য মুফতি সাহেবের পুস্তক হইতে এ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। "এইরূপ কথিত হয় যে মনারায় টীলা নামক আর একটী টীলার উপর রাজার অন্য একটী বাসভবন ছিল এবং তাহার পার্শ্বেই ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটী সুউচ্চ মন্দির বিদ্যমান ছিল। (ইসলাম জ্যোতি ১৮ পৃঃ) আবার ঐ পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় মুফতি সাহেব লিখিতেছেন যে, গৌড়গোবিন্দ শাহজলালের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহিলে শাহজলাল বলিয়াছিলেন যে এ স্থানের রাজ্যভার সিকন্দর গাজীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শাহজলাল গৌড়-গোবিন্দের নিকট একটি মসজিদ নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর চাহিয়াছিলেন। সেমতে রাজা গৌড়গোবিন্দ মসজিদ নির্ম্মাণোপযোগী প্রচুর পাথর যোগাইয়াছিলেন ইত্যাদি। রাজ্যত্যাগী পলায়নপর রাজা গৌড়গোবিন্দের পক্ষে শাহজলালের মসজিদ নির্ম্মাণের জন্য অসংখ্য পাথর যোগাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে কি? এবং ইচ্ছা থাকিলেই এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে অসংখ্য পাথর যোগাইবার সুবিধা হইতে পারে কি—যাহাই হউক শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয়ের পর মুফতি সাহেবের লিখিত মনারায় টীলার সন্নিকটস্থ রাজার সুউচ্চ দেব মন্দিরের সন্ধান আর পাওয়া গেল না। অনতিদূরে গৌড় গোবিন্দের প্রেরিত প্রস্তর দ্বারা (মুফতি সাহেবের মতে) মসজিদ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল। উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধারে কংসনিসূদন ইত্যাদি মন্দিরের শ্রীহট্টে অবস্থিতি ও তাহাদের পরিণতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে তাহা সমর্থন যোগ্য নহে কি?

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ভাটেরাতে তাম্রফলক দুইখানি পাওয়ায় (ভাটেরাতে তাম্রফলক পাওয়া যে অসম্ভব কিছুই নয় তাহা পরে দেখান যাইবে) ভাটেরাতেই তাম্রফলকোক্ত কংসনিসূদনের অভ্রভেদী প্রস্তর মন্দির

এবং মধুকৈটভারির উচ্চচূড় মন্দির নিশ্চয়ই ছিল, হট্টনাথ ও নিশ্চয় ভাটেরাতে ছিলেন গতিকে রাজাগণের রাজধানী ভাটেরাতে ছিল বলিয়া অনুমাণ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীহট্টে বা অন্যত্র যে তাম্রফলকের রাজাগণের রাজধানী হইতে পারে তাহা একেবারেই বিবেচনা করেন নাই। এস্থলে বোধ হয় ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ৺ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অধুনা প্রকাশিত বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে তাম্রফলকের রাজাগণ গৌড়গোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তীও হইতে পারেন এবং তাম্রফলকোক্ত দেবতাগণের স্থান শ্রীহট্টে হওয়া বিচিত্র নহে বলিয়া একটি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাম্রফলককে যাহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তী কালের বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকারের একটি বিশেষ যুক্তি ছিল যে—যদি তাম্রফলক দশম শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তীকালের হয় তবে তাম্রফলকে উল্লিখিত মধুকৈটভারির মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল? তাম্রফলকের কংসনিসূদনের সুদৃঢ় প্রস্তর মন্দিরের অসংখ্য প্রস্তরাদি কোথায় গেল? তিনি লিখিতেছেন ভাটেরাতে ত অনুসন্ধানে ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর একটীও পাওয়া যাইতেছে না। যদি ঐ সকল মন্দির ঐ সকল সময়ের হইত তবে কংসনিসূদনের অভ্রভেদী প্রস্তর মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর নিশ্চয়ই ভাটেরায় পাওয়া যাইত এবং একটী প্রস্তরও যখন ভাটেরাতে পাওয়া যাইতেছে না, গতিকে তাম্রফলক বহু বহু শতাব্দীর প্রাচীন। ইত্যাদি—

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে ভাটেরার ১ম তাম্রফলক ১০৪৯ খৃঃ নিকটবর্ত্তী সময়ের এবং কংসনিসূদনের অভ্রভেদী প্রস্তরমন্দির খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও মধুকৈটভারির উচ্চচূড় মন্দির তৎপরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির ইত্যাদি যদি ভাটেরাতে ঐকালে নির্ম্মিত হইত তবে উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরাদির সন্ধান ভাটেরাতে পাওয়া সম্ভব হইত কিন্তু ভাটেরাতে একটী প্রস্তরের ও সন্ধান মিলিতেছে না। অপর দিকে আমরা অন্যত্র অর্থাৎ শ্রীহট্টে কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দিরের অসংখ্য প্রস্তরের সন্ধান পাইতেছি

উপরোক্ত আলোচনা হইতে কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির শ্রীহট্টের মনারায়ের টীলার সন্নিকটেই ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। তাম্রফলক দুইখানি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে নবগীর্ব্বাণ, গোকুল, নবনারায়ণ, গোবিন্দ রণকেশব, ঈশান দেবের রাজধানী যে স্থানে ছিল, সেই স্থলে হট্টনাথ ছিলেন

এবং তথায় মধুকৈটভারির সুউচ্চ মন্দির ব্যতীত কংসনিসূদনের একটি অভ্রভেদী সুদৃঢ় প্রস্তর মন্দিরও ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীহট্টে একটি অভ্রভেদী প্রস্তর মন্দির যে ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে শ্রীহট্টেই কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির এবং কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির শ্রীহট্টে থাকিলে শ্রীহট্টে মধুকৈটভারির মন্দির, হট্টনাথ তথা নবগীর্ব্বাণ প্রভৃতির রাজধানী ছিল বলিয়া হট্টনাথের পাচালীতে যে উক্তি আছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। কারণ তাম্রফলক হইতে আমরা পাই হট্টনাথ যথায় কংসনিসূদন এবং মধুকৈটভারির মন্দিরও তথায় থাকিবে। রাজাগণের রাজধানীও তথায় থাকিবে। শ্রীহট্টেই যে হট্টনাথ (বটেশ্বর) ছিলেন এবং হট্টনাথই যে বটেশ্বর সে সম্বন্ধে কতক আলোচনা করা যাইতেছে।

হট্টনাথের পাচালীতে দেখা যায় গোবিন্দরণকেশব দেবের একাদশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহস্ত প্রয়াগস্থ অক্ষয় বটমূল হইতে বটেশ্বর শিব আনয়ন পূর্ব্বক নিজ রাজধানীর (সান্নিধ্যে) অগ্নিকোণে দেশের প্রধান হাট শীলাহট্টের দক্ষিণদ্বারে জটিয়া বটের তলে সায়রের তীরবর্ত্তী স্থানে হট্টনাথ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে সঙ্গে হট্টনাথের ৩৫ ধনু বামে হট্টকালীর প্রতিষ্ঠা করা হয়। হট্টনাথের পাটস্থান-হট্টপাট ও হট্টকালীর পাটস্থান প্রস্তর নির্ম্মিত মনুষ্য সমান উচ্চ ছিল। হট্টনাথ ও হট্টকালী অনাবৃত থাকিতেন। তাঁহাদের কোন প্রকার মন্দির বা গৃহ ছিল না।

হট্টনাথের পাটস্থান হট্টপাট শিবকেন্দ্রী একাদশহস্ত বৃত্তাকার ও হট্টকালীর পাটস্থান কালীকেন্দ্রী সপ্তদশহস্ত বৃত্তাকার ছিল।

আমাদের এই উক্তির সমর্থন তাম্রফলক ইত্যাদিতে কিছু পাওয়া যায় কি না দেখা যাউক।

প্রথম তাম্রশাসন পাঠে বুঝা যায় যে—

(১) বটেশ্বর শিবকে কৈলাসতুল্য তাহার কোন প্রিয় স্থান হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। (তিনি আদিকাল হইতে শ্রীহট্ট ছিলেন না)।

(২) বটেশ্বর শিবের স্থানকে হট্টপাট নামে অভিহিত করা হইত।

(৩) বটেশ্বর শিবকে ৩৭৫ হাল ভূমি ২৯৬ খানা বাড়ী গোবিন্দরণকেশব দান করেন।

(৪) দানকৃত ভূমির বিবরণ (নাম ও পরিমাণ ইত্যাদি) দিবার পূর্ব্বে তাম্রলিপিতে বলা হইয়াছে—প্রাদাৎ শ্রীহট্টনাথায় শিবায় শিবকীর্ত্তন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শিবের নাম বটেশ্বর তাহার স্থানকে হট্টপাট বলা হইত। এবং হট্টপাটে অবস্থানকারী বটেশ্বরকে শ্রীহট্টনাথায় ভাবে শেষ প্রয়োগ করা হইতেছে। গতিকে বটেশ্বরের যে অন্য নাম হট্টনাথ এবং সেই জন্যই যে তাহার পাটস্থানকে হট্টপাট বলা হইত তাহা সহজেই অনুমিত হয়। হট্টনাথের পাটস্থানই হট্টপাট। এস্থলে শ্রীহট্টনাথায় বলিতে শ্রীযুক্ত হট্টনাথকে বুঝাইতেছে। যেমন শ্রীহরি, শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি সেইভাবে শ্রীহট্টনাথ বলিতে শ্রীযুক্ত হট্টনাথকেই বুঝাইতেছে। হট্টনাথের পাটস্থান ভাটেরায় কি শ্রীহট্টে বা অন্য কোথায় ছিল তাহা তাম্রলিপি পাঠে জানা যায় না। হট্টনাথ নামটী যে কোন একটী হট্ট বা হাটের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

হট্টনাথের পাচালিতে বটেশ্বরকে প্রয়াগের অক্ষয় বটমূল হইতে শ্রীহট্টে আনয়ন এবং শীলাহট্টের দক্ষিণদ্বারে জটিয়া বটের তলে হট্টনাথ নামে প্রতিষ্ঠার উক্তি আছে। তাম্রলিপির উক্ত কৈলাসতুল্য শিবের প্রিয় স্থান প্রয়াগ হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। প্রয়াগের অক্ষয় বটও বিখ্যাত। অপিচ অক্ষয় বটমূলের শিব বটেশ্বর আখ্যা পাওয়াও স্বাভাবিক। তৎপর হট্টনাথ যে শ্রীহট্টে ছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে তাম্রফলক হইতে বুঝা যায় কংসনিসূদন যথায় মধুকৈটভারি তথায়, হট্টনাথ (বটেশ্বর) ও তথায় থাকিবেন। কংসনিসূদন শ্রীহট্টে থাকা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। গতিকে হট্টনাথ (বটেশ্বর) শ্রীহট্টে নিশ্চয়ই ছিলেন। হট্টনাথ যে শ্রীহট্টে ছিলেন তাহার সমর্থন এতদঞ্চলে প্রচারিত অন্য একটী প্রাচীন ছড়া হইতে পাওয়া যায়। যথা—

পুনির গড় ছাড়িয়া রাজা ছিলটেতে গেল।
হট্টনাথের পূজা করি ঠাকুরালি পাইল।

ভাটেরাতে তাম্রফলকদ্বয় পাইয়া গোবিন্দ রণকেশব প্রভৃতি রাজাগণের রাজধানী ভাটেরাতেই নিশ্চয় ছিল এবং গোবিন্দরণকেশবের হট্টনাথকে (বটেশ্বরকে) দান কৃত ভূম্যাদির সন্ধান সকলেই ভাটেরার চতুর্দ্দিকে করিয়াছেন এবং ঐ সকল ভূম্যাদির সন্ধান বিশেষ না পাইয়া ঐ সকল নামের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং

সেইজন্যই তাম্রফলক বহু বহু প্রাচীন কালের বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আমরা "শ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশে" গোবিন্দরণকেশব দেবের রাজধানী শ্রীহট্টে (বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরের উত্তর দিকবর্ত্তী উচ্চতর ভূমিতে) ছিল বলিয়া উক্তি করিয়াছি। হট্টনাথের পাঁচালী হইতে অনুমান করা যায় যে শ্রীহট্ট জিলার বিস্তৃত সমতল ও নিম্ন ভূমি সকল অর্থাৎ শ্রীহট্ট সদর মহকুমার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার উত্তর পশ্চিমাংশ, করিমগঞ্জ মহকুমার হাকালুকি প্রভৃতি অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশ এবং প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ মহকুমা তৎকালে অনেকটা জলতলে ছিল। ইহা একটী শাখা সাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল—ইহার নাম ছিল শ্রীচত্বল—শ্রীহস্তের চত্বল বা চাতলা। শ্রীচত্বল সাগরাংশ ভরাট হইয়া পড়িলে ঐ সকল ভূমির শ্রীচত্বল নামই রহিয়া গেল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হিউয়েনসাঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ভাটেরার প্রাপ্ত দ্বিতীয় তাম্রলিপি (যাহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বলিয়া অনুমিত হয়), স্থানীয় কিম্বদন্তী, শ্রীহট্টের প্রথম রেসিডেন্ট লিণ্ডসে সাহেবের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের লিখিত বিবরণ, সরজমিনের বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি হইতে আমরা ইহার সমর্থন পাই।

[হিউয়েন সাঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী শিলিচটল। ভাটেরার ২য় তাম্রলিপি যাহা খুব সম্ভব খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের ও গোবিন্দরণকেশবের পুত্রের কালের তাহাতে আমরা রাজার "পালভরে প্রধাবিত সমরতরী সকলের" এবং "সাগর পশ্চিমে" ইত্যাদি উক্তি দেখিতে পাই। স্থানীয় কিম্বদন্তী (১) কোন গৌড় রাজপুত্র সমুদ্র তনয় ছিলেন এবং সমুদ্র উচাইল হাসাগাড়া পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়া নিজপুত্রকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। (২) দিনারপুরের সদর ঘাট হইতে শ্রীহট্টের মনারায় টীলা পর্য্যন্ত একটী জলাকীর্ণ স্থান ছিল। - (৩) সদরঘাট ও মনারায়ের টিলায় একটী খেয়া ছিল। শ্রীচত্বলে বর্ত্তমানে ও বহুতর হাওর, বিল ইত্যাদি দৃষ্ট হয় সুরমা কুশীয়ারা প্রভৃতি নদীর গতি ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক (সাগর কোন) দিয়া।]

গোবিন্দরণকেশব দেবের রাজধানী শ্রীহট্ট সহরের নিকটস্থ উচ্চতর ভূমি সকলেই ছিল এবং তাহার রাজ্য—সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট সহরের নিকটস্থ উচ্চতর ভূমি সকল

উত্তরকাছ, দক্ষিণকাছ, বর্ত্তমান জৈন্তার অংশ বিশেষ, ভাটেরা ব্রহ্মচালের পাহাড়, লংলা, ইটা, হাকালুকির পূর্ব্বতটস্থ আদম আইল বা পাথারিয়া পাহাড়ের নিকটস্থ উচ্চ ভূমি সকল, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। (তৎকালে শ্রীচন্দ্রল বিশেষ ভরাট হয় নাই)। হট্টনাথের পাচালিতে গোবিন্দরণকেশবের উত্তর প্রদেশে কুচুণীয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্যদেশে দিগ্বিজয়ের কথা আছে। গৌড়রাজাগণের রঙ্গপুরাঞ্চলে একটী খণ্ড রাজ্যের ও উল্লেখ আছে। ভাটেরার তাম্রফলক হইতে ও গোবিন্দরণকেশবের দিগ্বিজয় ও অন্যান্য রাজাগণের উপর আধিপত্যের আভাস পাওয়া যায়।

গোবিন্দরণকেশব দেব হট্টনাথকে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬খানা বাড়ী দান করেন। ঐ সকল দানকৃত ভূম্যাদি শ্রীহট্টের সন্নিকটস্থ উচ্চতর ভূমি সকল, উত্তরকাছ, দক্ষিণকাছ, বর্ত্তমান জৈন্তার অংশ বিশেষ, ভাটেরা ব্রহ্মচালের পাহাড় লংলা, ইটা, হাকালুকির পূর্ব্বতটস্থ আদমআইল বা পাথারিয়া পাহাড়ের নিকটস্থ উচ্চ ভূমি সকল, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে থাকা সম্ভব। দিগ্‌বিজয়ের পরই সম্ভবতঃ হট্টনাথের শান্তিযজ্ঞ হইয়াছিল গতিকে উল্লিখিত ভূমিসকল ব্যতীত দানকৃত ভূম্যাদি কতেক উত্তরের পার্ব্বত্য প্রদেশে—কুচুনীয়া ইত্যাদি দেশে, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মুসলমান বিজয়ে শ্রীহট্টের অনেক ভূমির নামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং মুসলমান প্রভাব ঐ সকল নামে বিশেষভাবে পড়িয়াছে গতিকে শ্রীহট্টের সন্নিকটস্থ ভূমিসকলের প্রাচীন নাম বাহির করা কঠিন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাম্রশাসনে গাম (গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ) শব্দের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা—বড়গাম, বালুসী গাম, নড়কুটী গাম ইত্যাদি। জৈন্তা, পঞ্চখণ্ড, পাথারিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গাম শব্দের ব্যবহার অদ্যাপিও আছে। তাম্রফলকে ভূমির সীমা দিতে গিয়া "হড়িগঙ্গের" উক্তি দেখা যায় ইহা জৈন্তার হাড়িগাঙ্গ (সারিনদী) হইতে পারে কি না সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হট্টনাথের পাচালীতে দেখা যায় যে রাজা গুহক কংসনিসূদন স্থাপন করেন। ও তৎপুত্র রাজা গুড়ক মধুকৈটভারি স্থাপন করেন। তাঁহাদের কয়েক পুরুষ পরবর্ত্তী রাজা গোবিন্দরণকেশব কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং উক্ত গোবিন্দরণকেশবের পুত্রবধু রাণী কলাবতী (যাহার সহকারী রাজা

ছিলেন তাঁহার দেবর) মধুকৈটভারির মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত দেবতাগণের মন্দির পরবর্ত্তীগণ প্রতিষ্ঠা করিবেন ইহা স্বাভাবিক।

অপর দিকে তাম্রফলক হইতে দেখা যায় কেশব দেব কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তৎপুত্র ঈশান দেব (যিনি কেশবদেবের ১ম ও ২য় পুত্র হইতে পারেন না) মধুকৈটভারির মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং দেখা যায় যে মধুকৈটভারির মন্দির নির্ম্মান কেশবদেবের পুত্র ঈশান দেব স্থলে হট্টনাথের পাচালীতে কেশব দেবের পুত্রবধু রাণী কলাবতী করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইতেছে। ইহা তেমন অসামঞ্জস্য নহে তবে আমরা "শ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশে" রাণী কলাবতীর সহকারী একজন রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভবতঃ এই সহকারী রাজাই ঈশান দেব ছিলেন। কারণ গৌড় রাজবংশাবলী (১০পৃঃ) পর্য্যালোচনায় দেখা যাইবে যে গোবিন্দরণকেশব দেবের পর তাহার প্রথম পুত্র যাদব তৎপর তাহার দ্বিতীয় পুত্র কংসনারায়ণ তৎপর কংসনারায়ণের মৃত্যুর পর কংসনারায়ণের স্ত্রী রাণী কলাবতী নিজ শিশু পুত্রের (প্রবীরের) পক্ষে রাজত্ব করেন। রাণী কলাবতীর সহকারী রাজা ছিলেন, কেশবের চন্দনা গর্ভজাত একজন পুত্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে গোবিন্দরণকেশব কুচুনীয়া দেশে দিগ্বিজয়কালে সেই দেশের রাজকন্যা চন্দনাকে ভোগের নিমিত্ত যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গতিকে চন্দনা রাজার মুখ্য রাণীগণ অর্থাৎ সুনন্দাও কমলার সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। তৎগর্ভজাত গোবিন্দরণকেশবের পুত্রের পক্ষে রাজসিংহাসনের দাবী করাও সম্ভব ছিল না।

ভাটেরার প্রাপ্ত দ্বিতীয় ফলকে উল্লেখ আছে "রাজপুত্রো যঃ স্থবির পুত্রশূন্যঃ স্বহস্ততঃ॥ পাল্যং ভূহলদ্বয়ং সভাস্বশস্যবিস্তৃতঃ মৃতস্য রাজপুত্রস্য পত্নী যা কুলপালিকা। শিশুশ্চতনয়ঃ তস্যাপাল্যমেব তয়োরপি॥ আদেশিকভুৎ সমর প্রবীরঃ শ্রীবীর দত্ত পৃতনাধি নাথঃ।" ইহা হইতে দেখা যায় যে ঈশান দেব মধু-কৈটভারির নামে—মাত্র দুই হাল ভূমি দান করেন। উক্ত সামান্য ভূমি দান কালে তাহাকে অপুত্রক জ্যেষ্ঠ স্থবির রাজপুত্র যিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন, কুলপালিকা রাণী, নাবালক রাজপুত্র ও সেনাপতি বীরদত্তের অনুমতি মতে ও স্বীকৃতি মতে দান করিতে হইয়াছিল।

তাম্রফলকের উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী রাজকুমারের নাবালক কালে, রাজকুমারের জেষ্ঠতাত (স্থবির রাজপুত্র), মাতা, ঈশান দেব ও সেনাপতি বীরদত্ত মিলিয়া রাজ্যশাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। স্থবির রাজপুত্র (যাদব দেব) পুত্রশূন্য ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় একরকম অকর্ম্মণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলপালিকা রাণী ও ঈশান দেব বর্ত্তমানে সেনাপতি বীর দত্তের দ্বারা রাজ্য কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কুলপালিকা রাণীই (কলাবতী) পুত্রের যথার্থ অভিভাবক ছিলেন। তবে সম্ভবতঃ ঈশান দেব কুলপালিকা রাণীর সহকারী হিসাবেই রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন। ইহাদ্বারা হট্টনাথের পাচালীর সমর্থন তাম্রফলক হইতে পাওয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে ভাটেরাতে গৌড়রাজগণের প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গেল কেন ?—১ম তাম্রফলক হইতে বুঝা যায় যে, ভাটেরা প্রভৃতি অঞ্চল গোবিন্দরণ-কেশবের রাজ্যান্তর্গত ছিল কেন না তাম্রফলকে ভাটেরার সন্নিকটবর্ত্তী ২।৪টি স্থানের নাম পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে (৫—৬ পৃঃ) গোবিন্দরণকেশবের প্রপৌত্র গৌড়রাজা ভূজবীরের ভাটেরায় দুর্গ ও বিচার মঞ্চ স্থাপনের উক্তি করিয়াছি। তৎপর সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ বৈমাত্র ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে গৌড়রাজ্য বিভক্ত হইলে ব্রহ্মজিতের বর্ত্তমান ভাটেরা ব্রহ্মচাল ইত্যাদি নিয়া ব্রহ্মাঞ্চল রাজধানী স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিতের পর সেই শাখায় আরও তিনজন রাজা তথায় রাজত্ব করেন। গতিকে সেই স্থানে যথায় দুর্গ, বিচার মঞ্চ, এবং গৌড়বংশের এক শাখার রাজধানী পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল সেই স্থানে তাম্রফলক মিলা বিচিত্র নয়। ভাটেরা ব্রহ্মচাল প্রভৃতি স্থানে মুদ্রা, তাম্রফলক ইত্যাদি আরও মিলিতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই হইবে না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভাটেরার সন্নিকটে রাজবাড়ী ও নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মচাল রেল ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজবাড়ী বলিয়া স্থান বিশেষকে অদ্যাপিও কথিত হইয়া থাকে। ইহাই অনুমিত হয় যে ব্রহ্মচাল ভাটেরার পাহাড়েই ব্রহ্মাঞ্চল রাজধানী ছিল।

হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধারে লিখিত সুরমা নদীর সৃষ্টির বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—ইহা গৌড়রাজা ক্ষেত্রপালের সময়ে সৃষ্ট হয়।

এবং তাহার রাণী স্বরমার নামে ইহার নাম হয় স্বরম্যা নদী। গৌড়বংশাবলী (১০—১১ পৃঃ) পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ক্ষেত্রপাল গোবিন্দ-রণকেশবের পঞ্চম পুরুষ পরবর্ত্তী এবং শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের ৬ষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। গোবিন্দরণকেশবের কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের কাল খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। গৌড়গোবিন্দের পতন ঘটে ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খৃঃ। সুতরাং ক্ষেত্রপালের রাজ্যকাল আমরা অনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। অধিকন্তু পাচালীতে দেখা যায় যে ক্ষেত্র পাল রাজার সমসাময়িক ছিলেন লাউড়ের রাজা প্রনর্দ্দন। প্রনর্দ্দন রাজ্য ত্যাগী হইলে তাঁহার সমসাময়িক গুরুপুত্র অরুণাচার্য্য ও তৎপর বিজয়মাণিক্য লাউড়ে রাজত্ব করেন। বিজয়মাণিক্যের মুদ্রা ১১৯১ খৃঃ। অধিকন্ত ক্ষেত্রপালের পুত্রদ্বয় ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ, ত্রিপুররাজা ধর্ম্মধর এবং নিধিপতি বিপ্র সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং ক্ষেত্রপালের রাজ্যকাল আমরা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি।

সুরমা নদী মনুষ্য সৃষ্ট কাটানদী ইহা হট্টনাথের পাঁচালীতে উল্লিখিত হইয়াছে। নদীসকল প্রায়ই যে মনুষ্য দ্বারা কতকটা সৃষ্ট তাহার উদাহরণ শ্রীহট্টে বিরল নহে দৃষ্টান্ত স্থলে বাঘার খালই বর্ত্তমানে বড়ভাগা নদী, আমিরদীনের খালই—আমিরদীন নদী ইত্যাদি।

সুরমা নদী যে কতকটা কাটানদী ইহার সমর্থন বর্ত্তমান কালেও পাওয়া যাইতেছে। কারণ বরাক হইতে লোভার সংযোগ পর্য্যন্ত সাতগ্রাম আটবাক প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী নদীর অংশকে এখনও লোকে কাটা নদী বা কাটাগাঙ্গ নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বড় বেশী পূর্ব্বে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সুরমা নদীর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভাটেরার ২য় তাম্রফলক পাঠে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে শ্রীহট্টে একটি বড় হ্রদের অস্তিত্ব ছিল। ঐ সাগর বা হ্রদ দক্ষিণ পশ্চিমে অর্থাৎ সাগর কোণ দিয়া ক্রমাগত নিম্নগামী থাকিবে। সুরমা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীর গতি এবং সদর শ্রীহট্টের দক্ষিণ পশ্চিম ও সুনামগঞ্জ মহকুমার সুবৃহৎ হাওর ও বিলসকলের অস্তিত্ব

হইতেই ইহা সহজে অনুমিত হইবে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে ঐ সাগরের পূর্ব্বাংশ দিয়াই ক্রমে ক্রমে চর ভরট হওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং তৎকালেই সম্ভবতঃ বরাক নদী হইতে খাল কাটাইয়া মধ্যে মধ্যে ছড়া নদী বা অন্যান্য স্রোতের সংযোগে একটি স্রোতস্বতী শ্রীহট্ট সহরের কতক পশ্চিমে গিয়া সাগর বা হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। উত্তরের পাহাড়ের লোভা প্রভৃতি ছড়া নদী ঐ কাটা নদীতে ভর করায় শীঘ্রই সুরমা স্রোতস্বতীর (সম্ভবতঃ সায়রের উত্তর তট আশ্রয় ক্রমে) উদ্ভব হইয়াছিল।

সুরমা নদী সম্ভবতঃ হ্রদের সহিত মিলিত হওয়ার পর উপরোক্ত হ্রদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং কালক্রমে বরাক বা কুশিয়ারা এবং উক্ত সুরমা স্রোতস্বতীর আনীত পলিমাটিদ্বারা হ্রদমধ্যে স্থানে স্থানে চর বান্ধিয়া উন্নত হওয়ায় ক্রমে উক্ত হ্রদ অধিকাংশ ভরাট হইয়া পড়ে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নদীসকল প্রায়ই নানা প্রাকৃতিক কারণে এবং কখন কখন বা মনুষ্যের চেষ্টায় গতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সেইজন্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সুরমার গতি কোন দিক দিয়া ছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা দুরূহ। [বরাক নদীই কুশিয়ারা নদী। সুরমা নদী, বরাক বা কুশিয়ারা নদীর শাখা বিশেষ বলিয়াই অনুমান করা যায়। বরাক বা কুশিয়ারা নাম দুইটি সমান অর্থজ্ঞাপক। সম্ভবতঃ যে নদীর তীরে শ্রেষ্ঠ আকের জন্ম, তাহাকেই বড় আক বা বরআক নামে অভিহিত করা হইত। এতদঞ্চলে আকের অন্য নাম কুশিয়ার বিধায় সম্ভবতঃ বরাকের কতক অংশকে কুশিয়ারা নামেও অভিহিত করা হইতেছে। বরবক্র, ক্রোশীরা ইত্যাদি নাম অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতগণের দেওয়া বলিয়াই অনুমান করা যায়।]

শ্রীহট্ট জিলার বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের দুইখানি কুলগ্রন্থ বৈদিক সংবাদনী ও বৈদিক পুরাবৃত্ত। তাঁহাদের প্রদত্ত ইতিহাস অনেকটা কিম্বদন্তী ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের প্রদত্ত ইতিহাসটি সংক্ষেপে এই যে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে (৬৪১ খৃঃ) ত্রিপুরার রাজা (আদি) ধর্ম্মপার অনুষ্ঠিত একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য পঞ্চগোত্রীয় শ্রীনন্দ, আনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। যজ্ঞ সমাপনের পর তাঁহারা (আদি) ধর্ম্মপা হইতে পঞ্চখণ্ড অঞ্চল ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রাপ্ত হয়েন। পঞ্চগোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণগণ কিছুকাল

পরে তাঁহাদের স্বদেশ হইতে আরও পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহাঁরাই দশগোত্রীয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের প্রদত্ত ইতিহাস হইতে ইহাও দেখা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯৫ খৃঃ) বাৎস্য গোত্রীয় মৈথিলী নিধিপতি ত্রিপুরার রাজা ধর্ম্মধরের অনুষ্ঠিত এক বৈদিক যজ্ঞে হোতা ছিলেন। যজ্ঞান্তে নিধিপতি ত্রৈপুর রাজা হইতে শ্রীহট্টের ইটা ভূমি ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রাপ্ত হয়েন।

অপর দিকে হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধারে দেখা যায় যে গৌড় রাজা গোবিন্দরণকেশব (ভাটেরায় প্রাপ্ত ১ম ফলক দাতা) হট্টনাথের শান্তিযজ্ঞ, গো-সহস্র দান যজ্ঞ, তুলাপুরুষ, কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করেন. এবং ঐ সকল সময়ে মিথিলা, কনৌজ প্রভৃতি পশ্চিম দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ এদেশে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে অতি শুদ্ধাচারী পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কতেকজন ছিলেন। পঞ্চগোত্রীয়গণ রাজার নিকট হইতে ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়া এদেশে অবস্থান করেন। তৎপর পঞ্চগোত্রীয়গণ বিবাহ সম্বন্ধাদির সুবিধার জন্য তাঁহাদের স্বদেশ হইতে আরও পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারাও গোবিন্দরণকেশব কর্ত্তৃক এদেশে স্থাপিত হয়েন। ইহা হইতে আরও দেখা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হট্টনাথের বর্ণ বিপর্যায় ঘটায় গৌড়রাজা ব্রহ্মজিৎ যখন হট্টনাথের বর্ণবিজ্ঞানানুযায়ী রাজধানী ত্যাগক্রমে ভাটেরার দুর্গ ও বিচারমঞ্চের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে হট্টনাথের বর্ণবিপর্যায়ের প্রতিকার ও রাজধানীর পবিত্রতা সাধনের জন্য একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। নিধিপতি দ্বিজ ঐ যজ্ঞে হোতা ছিলেন (সম্ভবতঃ এই যজ্ঞের স্থল ভাটেরার হোমের টিলা)। ব্রহ্মাঞ্চলের যজ্ঞে পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ধর্ম্মধর সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। ব্রহ্মাঞ্চলের যজ্ঞান্তে নিধিপতি গৌড়বংশীয় ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ হইতে দক্ষিণ গৌড়ের অন্তর্গত একটি ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রাপ্ত হন। নিধিপতি দ্বিজের প্রাপ্ত ইষ্টা ভূমিই ইটা ভূমি। তৎপর ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধর শাকুনপোদ্রবে ভীত হইয়া রাজবাস্তুর বাহিরে অরণ্য প্রদেশে নিধিপতি দ্বারা অনুরূপ একটা যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মজিৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। নিধিপতি ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধর হইতে ব্রহ্মাঞ্চল ও ত্রিপুর রাজ্যের সীমান্তের বালিশিরার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রাপ্ত হন।

শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের অনেকের আদিপুরুষ মুসলমান আমলের পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্বকালে এদেশবাসী হয়েন এবং হিন্দু রাজাগণ হইতেই তাঁহারা ভূমিদান, সামাজিক মর্য্যাদা ইত্যাদি পাইয়া থাকিবেন। সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের বাস শ্রীহট্টের সমুন্নত ও উচ্চতর ভূমিসকলে। কারণ তাঁহারা যে সময়ে শ্রীহট্টে সমাগত তখন শ্রীচত্বল (শ্রীহট্ট জিলার বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র) অনেকটা জলাকীর্ণই ছিল। এস্থলে ইহাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শ্রীচত্বল (শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্র) বাসী উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ভদ্র পরিবার প্রায়ই মুসলমান আমলে রাঢ়, বঙ্গ ইত্যাদি স্থান হইতে শ্রীহট্টে সমাগত। দুই চারিটি পরিবার শ্রীহট্টের উচ্চতর ভূমিসকল হইতে পরবর্ত্তী কালে উক্ত সমতল ক্ষেত্রবাসী হইয়া থাকিবেন।

কেহ কেহ (আদি) ধর্ম্মপার (৬৪১ খৃষ্টাব্দের) প্রদত্ত পঞ্চব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরের একখানি তাম্রফলক ও নিধিপতি বিপ্রের (ধর্ম্মধর হইতে প্রাপ্ত) ইটা ব্রহ্মোত্তরের (১১৯৫ খৃঃর) একখানি তাম্রফলক—এই দুইখানি তাম্রফলকের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ দুইখানি তাম্রপত্রের কোন সন্ধান বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

শ্রীহট্টের দক্ষিণ সীমানায় কৈলারগড়ের (কৈলাসহরের) রাজবাটীর জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে হোমের গাত (হোমের গর্ত্ত) বলিয়া একটী স্থান আছে (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ১ম খঃ ৫ম অধ্যায় ৬৪।৬৫ পৃঃ)। কৈলারগড়ের হোমের গর্ত্তেই ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধরের নিধিপতি দ্বিজ দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থল বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাই সম্ভবজনক বলিয়া মনে হইতেছে। অপরদিকে ভাটেরায় হোমের টিলা, দক্ষিণাকান্দি ইত্যাদি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। হোমের টিলায় একটি গর্ত্ত ছিল, ইহা স্থানীয় একজন ভদ্রলোক কিছুকাল হইল ভরাট করাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তবে ঐ হোমের টিলায় কখন কে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

হট্টনাথের পাচালী হইতে অনুমান করা যায় যে গৌড়বংশীয় ব্রহ্মজিৎ ও ধর্ম্মধ্বজ ব্রহ্মাঞ্চলে নিধিপতি দ্বারা যে বৈদিক যজ্ঞ করেন তাহাই সম্ভবতঃ ঐ হোমের টিলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ ইত্যাদি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হট্টনাথের পাচালীতে মৈথিলী বা পশ্চিম দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যে উক্তি আছে (৪ পৃষ্ঠা) তাহার কোন সমর্থন সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের কুল-গ্রন্থ কি অন্যান্য জিনিষ হইতে পাওয়া যায় কি না দেখা যাউক।

বৈদিক পুরাবৃত্তে সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের শ্রীহট্টে আগমনের কতকটা উক্তি আছে। যথা—

(ক) ত্রিপুর রাজা (আদি) ধর্ম্মপা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তৎপূর্ব্বে তিনি বলভদ্র সিংহের অনুষ্ঠিত অন্য যজ্ঞ দর্শন করিয়াছিলেন।

(খ) (আদি) ধর্ম্মপার যজ্ঞে আহূত পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ (সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের আদি পুরুষ বলিয়া কথিত) যজ্ঞান্তে সিন্ধুদেশে যবনোপদ্রব জন্য আর কান্যকুব্জে না গিয়া আদি ধর্ম্মপার নিকট কতক ভূমি প্রার্থনা ক্রমে এ দেশে থাকিয়া যান।

(গ) পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার রাজধানীতে শক্তি, বিষ্ণু ও শিব প্রতিষ্ঠা ও সংকীর্ত্তনাদিতে ন্যস্ত ছিলেন।

(ঘ) পঞ্চ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তাবৎ জাতিহীন ব্রাহ্মণগণকে তন্ত্রোপদেশ করেন।

(ঙ) পঞ্চ বিপ্র পথে পথে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করায় দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীভূত হয়। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত)

ত্রিপুরার রাজা (আদি) ধর্ম্মপার সময়, তথা যজ্ঞকাল ৬৪১ খৃঃ বলিয়া বলা হইতেছে—এই সময় ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অপিচ বৌদ্ধবিজয়কারী শঙ্করাচার্য্য বা কুমারিলভট্টের ও পূর্ব্ববর্ত্তী কাল।

সুতরাং ত্রিপুরার রাজা ধর্ম্মপার কালে পঞ্চ তপস্বীর পশ্চিমে যবনোপদ্রব ভয়, কি বৌদ্ধ বিজয় কি তন্ত্রোপদেশ দেওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু ত্রিপুরার রাজধানীতে ৬৪১ খৃঃ নিকটবর্ত্তী কালের প্রতিষ্ঠিত শক্তি, শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। (ইতিবৃত্ত)

ইহা হইতে অনুমান করা যায় পশ্চিমে যবনোপদ্রব, বৌদ্ধ বিজয়, তন্ত্রোপদেশ, আহ্বানকারী রাজার রাজধানীতে শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সহিত সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের এ দেশে আগমনের সংস্রব কিছু আছে, এবং বিভিন্ন দলে

বিভিন্ন সময়ে মিথিলা, কনৌজ প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহারা খৃষ্টীয় দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হট্টনাথের পাচালীর উল্লিখিত গোবিন্দ-রণকেশব কি তাঁহার পরবর্ত্তীর দ্বারা গৌড়ে (শ্রীহট্টে) কংসনিসূদনের মন্দির প্রতিষ্ঠা, তুলাতুরুষ, গোসহস্রদান যজ্ঞ, হট্টনাথের শান্তিযজ্ঞ, মধুকৈটভারির মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এবং ব্রহ্মাঞ্চলে (ভাটেরা ব্রহ্মচালে) ব্রহ্মজিৎ কর্ত্তৃক নূতন রাজধানীতে কংসনিসূদন, মধুকৈটভারি, হট্টনাথ ও হট্টকালীর প্রতিনিধি দেবতা প্রতিষ্ঠার কালে, ব্রহ্মাঞ্চলের যজ্ঞ (ভাটেরার হোমের টিলায়) এবং প্রায় সমকালেই ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধরের যজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ পশ্চিমে মুসলমান আক্রমণের দরুণ পূর্ব্বাঞ্চলে হিন্দু রাজার আশ্রয়ে ও আসিয়া থাকিবেন।

ত্রিপুরার রাজা ধর্ম্মপা পূর্ব্বে একটী যজ্ঞ দর্শনের পর নিজে অনুরূপ যজ্ঞ করেন তাহা বৈদিক পুরাবৃত্ত হইতে পাওয়া যাইতেছে। সেই পূর্ব্বের যজ্ঞ কোথায়, কোন রাজদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ? বৈদিক পুরাবৃত্ত বলিতেছেন তাহা পশ্চিমের বলভদ্র সিংহের।

(আদি) ধর্ম্মপার (৬৪১ খৃ:) সমসাময়িক বলভদ্র সিং বলিয়া পশ্চিমের কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। (আদি) ধর্ম্মপা ৬৪১ খৃ: নিকটবর্ত্তী সময়ের হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। ত্রিপুরার রাজা যে পূর্ব্বে অন্য রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দেখার পর নিজে অনুরূপ যজ্ঞ করেন ইহার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই হর্ষবর্দ্ধনের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দর্শনের পরই ধর্ম্মপা যজ্ঞ করেন এবং হর্ষবর্দ্ধনেরই অন্য নাম বলভদ্র সিংহ ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়া থাকে।

আমাদের মনে হয় বলভদ্র সিংহ সম্ভবত: খৃষ্টীয় একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীর খুব সম্ভব হয়ত: গোবিন্দরণকেশবের সমসাময়িক কি গৌড় রাজা ব্রহ্মজিৎ ধর্ম্মধ্বজ ও ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধরের সমসাময়িক মিথিলা, কনৌজ কি অন্য কোন পশ্চিম দেশের রাজা হইবেন। তাহার রাজ্য হইতে হয়ত: অনেক ব্রাহ্মণ এ দেশে তৎকালে আসিতে পারেন।

সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের মধ্যে হয়ত: দুইটী যজ্ঞের—একটি ত্রিপুরার রাজা ধর্ম্মধরের অন্যটি অন্য রাজা দ্বারা অন্যত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এইভাবে একটী ধারণা আছে। বিপুল রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিপ্লবে গৌড় ব্রহ্মাঞ্চলের কথা এমন কি ব্রহ্মাঞ্চলের

(ভাটেরা হোমের টিলায়) গৌড়বংশীয়গণের নিধিপতি দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞের যজ্ঞ কর্ত্তাগণকে তাহারা ভুলিয়া থাকিতে পারেন, এবং তৎস্থলে ৭ম শতাব্দীর ত্রিপুররাজবংশের ধর্ম্মপা (আদি) কে বসান হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলে, ইহা অস্বাভাবিক কিছু হয় কি ? সম্ভবতঃ গৌড়বংশের অবসানের পর সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ ত্রিপুররাজছত্র তলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে)।

ভাটেরার তাম্রলিপি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে গোবিন্দরণকেশব কংস নিসূদনের প্রস্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং হট্টনাথের শান্তিযজ্ঞ (সম্ভবতঃ ইহাতেই প্রথম ফলকের ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাড়ী দান করেন) তুলাপুরুষ ইত্যাদি সৎকাজ করেন। সেই সময়ে ভিন্ন দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন। তাম্রফলকে ইহাও দেখা যায় যে গোবিন্দরণকেশবের পুত্রের সময়ও মধুকৈটভারির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাম্রফলকদ্বয় হইতে দেখা যায় যে গোবিন্দরণকেশবের নিকট অভিষ্ট লাভে কৃতজ্ঞ চিত্ত আগত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের জন্মস্থান ভুলিয়া যাইতেন। "আগত্য সম্পন্ন মনোরথাশ্চ ন সস্মরুর্জন্মভূবং দ্বিজেন্দ্রাঃ" আমাদের মনে হয় ব্রহ্মোত্তরভোগী ঐ সকল বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ তৎকালে মিথিলা, কনৌজ, পশ্চিম গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া গোবিন্দরণকেশবের রাজ্য শ্রীহট্ট সহরের সন্নিকটবর্ত্তী উচ্চ ভূমিসকল, ভাটেরাব্রহ্মচাল অঞ্চল, হাকালুকির পূর্ব্বতটস্থ পাথারিয়া পাহাড়ের সন্নিকটস্থ উচ্চ ভূমিসকল, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি উচ্চতর ভূমিতে স্থান পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের আদিপুরুষ হইবেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী গোবিন্দরণকেশব দেবের সমসাময়িক কাল শ্রীহট্টের পক্ষে একটী স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। তন্নিকটবর্ত্তী কালেই জৈন্তায় কামদেব (কেশব দেব ও কামদেব একই গৌড়বংশীয়) রাজত্ব করিতেছিলেন। কামদেবের সভায়ও বহু বিদেশী বিদ্বান ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং রাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া কথিত হয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের বংশাবলী পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে অনেকের আদিপুরুষ গোবিন্দরণকেশব দেবের সমসাময়িক কালের কিম্বা তৎপরবর্ত্তী কালের।

গোবিন্দরণকেশব ও তৎপরবর্ত্তীগণ বিভিন্ন প্রকার সৎকাজ করিয়া থাকিবেন, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর নিকটবর্ত্তী কালে বা তৎপরবর্ত্তীকালেও ঐ সকল রাজাগণদ্বারা ব্রাহ্মণ স্থাপন করা অতি স্বাভাবিক।

রাষ্ট্র বিপ্লব এবং ধর্ম্ম বিপ্লব বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিষ। শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌড় গোবিন্দের পতনের সঙ্গে সঙ্গে (১৩০২ খৃঃ) বিপুল রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে শ্রীহট্টের অনেক কিছুই অদল বদল হইয়া গেল। মুসলমানগণ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর নবোত্থিত সমতল ভূমির দিকে মনযোগী হইলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে উত্তরে জৈন্তা এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা নিজ নিজ রাজ্য সীমা বর্দ্ধিত করিলেন। উদাহরণ স্থলে একলাখী গয়ার অঞ্চল ও দক্ষিণশূর (দক্ষিণ শ্রীহট্টের সাতগাও প্রভৃতি অঞ্চলের সুবৃহৎ ভূখণ্ড), এই দুই বৃহৎ ভূখণ্ড যাহা গৌড়ের রাজা গৌড় গোবিন্দ চক্রপাণি পুত্রদ্বয় মুকুন্দ ও মহীপতিকে দান করিয়া ছিলেন বলিয়া চিরাগত প্রবাদ, ঐ দুই অঞ্চলই দেখা যায় পরবর্ত্তীকালে যথাক্রমে জৈন্তার ও ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম বিপ্লবের দরুণ গৌড়রাজ্য, গৌড় গৌরব, গৌড় পঞ্চ দেবতা অর্থাৎ গ্রীবাপীঠ, হট্টনাথ (বটেশ্বর), হট্টকালী, কংসনিসূদন, মধুকৈটভারি ইত্যাদি ক্রমে লোকে ভুলিয়া গেল। (শ্রীহট্ট জিলার সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যাঁহারা তাঁহারা প্রায় সকলেই মুসলমান আমলে শ্রীহট্টে সমাগত গতিকে প্রাচীন কাহিনী ইত্যাদি তাঁহাদের বিশেষ জানা সম্ভব নয়)। উত্তরের যাহা কিছু সমস্তই জৈন্তার যেমন লাখাই পর্য্যন্ত জৈন্তা রাজ্যের সীমা ছিল (সম্ভবতঃ গৌড় স্থলে জৈন্তা বসান হইয়াছে) ইত্যাদি উক্তি এবং দক্ষিণদিকের যাহা কিছু এমন কি সাতগাও, ভাটেরা, ব্রহ্মাঞ্চল, ইটা প্রভৃতি অঞ্চল ত্রিপুরার হইয়া গেল। মধ্য হইতে গৌড় যাহা জৈন্তা বা লাউড় হইতে প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত—সেই গৌড় দেশ যেন শূন্যে বিলীন হইল। (যদিও উচাইলের হাসাপাড়া পর্য্যন্ত সমুদ্র সরিয়া গিয়া গৌড়রাজ্যের ভূমি বিধায়ক হইয়াছিলেন বলিয়া একটী ক্ষীণ কিম্বদন্তী আছে)। শ্রীহট্টের বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ যাহারা হিন্দু রাজাগণের আমলে এদেশে আগত, তাঁহারা সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিপুর রাজছত্র তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গৌড়, ব্রহ্মাঞ্চলের হিন্দু রাজাগণের ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তরভোগী অসংখ্য ব্রাহ্মণ পরিবার মধ্যে আজ গৌড়, ব্রহ্মাঞ্চলের স্থাপিত একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের

নাম গন্ধ মিলে না। ভাটেরার তাম্রফলক পাঠে দেখা যায় ঐ সকল রাজাগণ শুদ্ধ আর্য্যাচারী ছিলেন। তাঁহারা যাগ, যজ্ঞ, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকাজ করিয়াছিলেন। তাম্রফলক পাঠে অনুমান করা যায় যে তুলা পুরুষাদি যজ্ঞে দান প্রাপ্ত হইয়া বিদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল প্রভাবে (ধর্ম্ম বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবই ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী) আজ আর ঐ সকল নৃপতিগণের স্থাপিত একটা ব্রাহ্মণ পরিবারও পাওয়া যাইতেছে না। প্রাচীন যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই ত্রিপুরার রাজার আশ্রয়ে এ দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাকেই বলে কালস্য কুটিলা গতি।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে গৌড়গোবিন্দ সম্বন্ধে কিম্বদন্তীমূলে লিখিত হইতেছে যে—গৌড়গোবিন্দ বরুণদেবের (জলের দেবতার) তনয় অর্থাৎ কোন গৌড়রাজার ক্ষেত্রজ সন্তান। বরুণের অভিপ্রায়ে সমুদ্রের জল সরিয়া যতদূর চড়া পড়িয়াছিল ততদূর পর্য্যন্ত গৌড়গোবিন্দের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

হট্টনাথের পাচালীতে ক্ষেত্রপাল রাজার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ সম্বন্ধে অনেকটা এই প্রকার উক্তি আছে।

ঐ সকল ঔপন্যাসীক কিম্বদন্তী হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে কোন গৌড় রাজকুমারের জন্মের অব্যবহিত পরেই শ্রীচত্বল জুড়িয়া বৃহৎ বৃহৎ চর সকল লোক নয়ন গোচর হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে কতদূর পর্য্যন্ত গৌড়রাজাগণ ঐ সকল চর ভরাট ভূমির অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। পাচালী মতে দেখা যায় যে ক্ষেত্রপালের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহস্তের বন্ধন (সম্ভবতঃ উচাইল) পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতটুকু সাগরাংশ শ্রীচত্বল (শ্রীহস্তের চত্বল বা চাতলা) আখ্যা পাইয়াছিল ততদূর পর্য্যন্তই ধর্ম্মধ্বজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে গৌড় গোবিন্দের সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্রীচত্বল জুড়িয়া চর সকলের প্রথম উদ্ভব না হইয়া তাহার ৬ষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্বে ধর্ম্মধ্বজের বাল্যকালে (অনুমানিক খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে) ইহা হওয়া অধিকতর সম্ভবজনক।

গৌড়গোবিন্দ সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে গোবিন্দ **শ্রীহট্ট** জিলার কোন হাওরের পর পার হইতে আসিয়া ভাগ্যবশে রাজাধিকারী হয়েন। গোবিন্দ ব্রহ্মাঞ্চলের (ভাটেরা ব্রহ্মচালের) রাজকুমার। ব্রহ্মাঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় তিনি দ্বাদশ জন বালক সহ জঙ্গলে পলায়ণ করেন তৎপর

গুরু গিরিধারী দ্বাদশ বর্ষ তাহাদিগকে রণশিক্ষা ইত্যাদি দেওয়ার পর ঘটনা চক্রে, গৌড়রাজা গোবর্দ্ধন পার্ব্বত্যগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে, গৌড় (উত্তর ও দক্ষিণ গৌড়ের) অধিকারী হয়েন ইত্যাদি (৬—৭ পৃঃ) হট্টনাথের পাচালী হইতে পাওয়া যাইতেছে।

গৌড়গোবিন্দের রাজ্যকাল খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ গতিকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্মাঞ্চল (ভাটেরা ব্রহ্মচাল ও মৌরাপুরের পাহাড়) ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফেচুগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে একটী বিস্তৃত সায়র বা হাওর বিদ্যমান ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বর্ত্তমানে ও বর্ষাকালে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (বংশ খণ্ড) উল্লেখ আছে যে ভাটেরাতে যখন তাম্রফলক পাওয়া যায় তখন যোগী জাতীয় বৃদ্ধ শম্ভুনাথ উল্লেখ করিয়াছিল যে সে তাহার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিল যে ভাটেরার রাজবাড়ী কুকিগণ ধ্বংস করিলে রাজকুমার জঙ্গলে পলায়ণ ক্রমে প্রাণ বাচান। ভাটেরাতে স্থানীয় কিম্বদন্তী মুলে ইহা রাজা গৌড়গোবিন্দের বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত হয় ইত্যাদি। ইতিবৃত্তে উল্লিখিত শম্ভুনাথ কথিত কিম্বদন্তীর সহিত হট্টনাথের পাচালী লিখিত—গৌড়গোবিন্দ ব্রহ্মাঞ্চলের রাজকুমার—ত্রিপুরী সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মাঞ্চল ধ্বংস ও গোবিন্দের পলায়ণ ও পরবর্ত্তীকালে উভয় গৌড়ের অধিকারী হওয়ার যে উক্তি আছে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

গোবিন্দ ভাগ্যবশে গৌড়ে আসিয়া রাজ্যাধিকারী হয়েন, তিনি শ্রীহট্টে নবাগত। গৌড়গোবিন্দের খুড়ীমাতা অপর্ণাই রাজার মা ও অপর্ণার পুত্রবধু শান্তি—এই প্রকার কয়েকটী কিম্বদন্তী আছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে গৌড়রাজ বংশাবলী (১১ পৃঃ) পর্য্যালোচনায় গৌড়গোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়রাজা গোবর্দ্ধন ও তৎ-পুর্ব্বে তাঁহার পিতা ভবানন্দের নাম দেখা যাইবে। এতদঞ্চলে গোবর্দ্ধন রাজার এবং বোকা রাজা ভবানন্দ ও ষোলদ্বিপ (হলুড্ডিপাই) পাত্রের ২১৪টি গল্প এখনও প্রাচীনদের নিকট শুনা যায়। ২৭৬/৩৮

শ্রীহট্ট জিলার উত্তরাংশে অবস্থিত পার্ব্বত্য ও সমুন্নত ভূমিতে লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া নামে তিনটী হিন্দুরাজ্য ছিল। লাউড় রাজ্যের রাজধানী লাউড়, গৌড় রাজ্যের রাজধানী গৌড় এবং জয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজধানী জয়ন্তিয়া বলিয়াই অভিহিত হইত। উপরোক্ত তিনটী রাজ্য মধ্যে গৌড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

গৌড়ের শেষ রাজার নাম ছিল গৌড়গোবিন্দ। গৌড় হইতেই শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম গৌড়। এই সকল উক্তিতে মতদ্বৈধ বিশেষ নাই।

হট্টনাথের পাচালীতে দেখা যায় যে গৌড়গোবিন্দের সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ গৌড়ের মিলন হয় এবং তাঁহার রাজত্ব কালেই গৌড় রাজধানীতে অবস্থিত দেশের প্রধান হাট শীলাহট্টের শ্রীহট্ট নামাকরণ হয়। তৎপর রাজধানী এবং রাজ্যের অর্থাৎ গৌড়গোবিন্দের অধিকারভুক্ত স্থানের শ্রীহট্ট নাম জারী হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট বলিতেই মুলতঃ একটী হট্ট বা হাটের কথা মনে উদয় হয়। শীলাহট্ট বলিতেও মুলতঃ একটি হুট্ট বা হাটকেই বুঝায়।

বর্ত্তমানকালেও আমরা শীলট্ট, শীলহাট বা ছিলট বলিতে রাজধানীর প্রধান হাট, নগর এবং দেশকে (জেলাকে) বুঝিয়া থাকি। শীলট্ট, শীলহাট বা ছিলট নাম প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত। অপর দিকে শ্রীহট্ট বলিতেও আমরা উপরোক্ত হাট, নগর ও দেশকেই বুঝিয়া থাকি।

শ্রীহট্ট হাটের নামেই গৌড়নগর ও গৌড়দেশের শ্রীহট্ট নাম যে হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কারণ শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি একটি হাটের উপলক্ষেই হইয়া থাকিবে। নগর বা দেশের উপলক্ষে হওয়া সম্ভবপর নয়।

শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের সময় দেশের এবং রাজধানীর নাম গৌড় থাকা অসম্ভব কিছু নয়। গতিকে দেশের বা নগরের নাম শ্রীহট্ট তাহা গৌড়গোবিন্দের

বর্ত্তমান শ্রীহট্ট দেশকে প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীহট্ট নামে যে কথিত হইত তাহার প্রমাণ স্বরূপ কেহ কেহ জলন্ধর রাজ বধু প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের প্রশস্তির অগ্রভাগে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" বলিয়া একটি উক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা এতদ্দেশ যে ৮০০ খৃঃ শ্রীহট্ট নামে অভিহিত হইত তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু প্রশস্তির অগ্রভাগে স্থাপিত শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ, মুললিপি (যাহাকে ৮০০ খৃঃ বলা হয়) হইতে অর্ব্বাচীন। (কামরূপ শাসনাবলী)

শ্রীহট্ট নাম যদি এতই প্রাচীন হইবে তবে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েনসাঙ এ দেশকে শ্রীহট্ট না বলিয়া শীলিচটল বলিয়াই উল্লেখ করিলেন কেন?

কেহ কেহ যোগিনীতন্ত্রে শ্রীহট্টের সীমা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তবে যোগিনীতন্ত্রে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কোচ বিহারের রাজা বিশ্বসিংহের ও

কালেই হইয়াছিল বলিয়া যে উক্তি হট্টনাথের পাচালীতে আছে তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে রাজধানীতে অবস্থিত হাটের নাম "শ্রীহট্ট" প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। তবে শীলট্ট, শীলহাট বা ছিলট এই সকল প্রাচীন ও বহুল প্রচারিত নাম কোথা হইতে আসিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় এ দেশকে ছিলট্ট নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট শব্দের অপভ্রংশ ছিরিহট্ট হইতে পারে।

অপরদিকে হট্টনাথের পাচালীতে রাজধানী মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন হাট শীলাহট্টের, শ্রীহট্ট নামাকরণ ও তৎপর নগরের ও রাজ্যের ঐ নাম জারি হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। শীলাহট্টের অপভ্রংশ শীলট্ট, শীলহাট, ছিলট ইত্যাদি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময় যে প্রাকৃত জিনিষকে শেষে সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার ও উদাহরণ বিরল নহে।

তারপর হট্টনাথের পাচালী মতে দেখা যায় যে গৌড়গোবিন্দের অধিকারভুক্ত স্থানই শ্রীহট্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। জৈন্তা গৌড়গোবিন্দের রাজ্যান্তর্গত ছিল না। এইজন্যই বোধ হয় জৈন্তাকে শ্রীহট্ট বলা হয় না। অবশ্য জৈন্তা বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট রাজধানীর শাসনাধীনে আসায় এখন জৈন্তা প্রভৃতি স্থানকে শ্রীহট্ট বলা যাইতে পারে।

নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে যোগিনীতন্ত্র হয়তঃ বিশ্বসিংহের সময়ে রচিত বা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আর যোগিনীতন্ত্র মতে শ্রীহট্টের যে সীমা তাহার মধ্যে জৈন্তাকেও আকর্ষণ করে গতিকে পীঠ মালা মতে শ্রীহট্টে গ্রীবা এবং জৈন্তায় বামজঙ্ঘা এই প্রকার উক্তির সার্থকতা থাকে কোথায় ?

কেহ কেহ ভাটেরার তাম্রফলকে "প্রাদাৎ শ্রী-হট্টনাথায় শিবায় শিবকীর্ত্তন :—" হইতে শ্রীহট্ট রাজ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু ইহা শ্রীহট্টনাথ নহে শ্রীযুক্ত হট্টনাথই হইবে (৺ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

কেহ কেহ বা দেবীর হস্তপাত জন্য শ্রীহস্ত হইতে শ্রীহট্ট এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। তবে শ্রীহট্টে দেবীর হস্ত পাত হয় নাই। গ্রীবা পাত হইয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

হট্টনাথের পাঁচালী হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে প্রাচীনকালে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জিলার উত্তরাংশে অবস্থিত উচ্চতর ভূমি সকল এককালে কামরূপ নামে পরিচিত হইত। পরবর্ত্তী কালে ঐ অংশ লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। গৌড়ের শিলীচটল, শিলীদেশ, শীলাহট্ট বা শীলট, এবং অংশবিশেষ শ্রীচন্থল বা ছিরিচন্থল ইত্যাদি নাম ছিল। সর্ব্বশেষে গৌড়, শ্রীচন্থল ইত্যাদি মিলিয়া দেশের নাম হয় শ্রীহট্ট।

মগধ রাজ্য

হট্টনাথের পাঁচালীতে দেখা যায় যে ব্রহ্মাঞ্চলের যজ্ঞে অঙ্গদেশের যুবরাজ ছত্র-সিংহ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের পর, ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মধর কর্ত্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ছত্রসিংহ ধর্ম্মধরের যজ্ঞে আগমন করেন। ছত্রসিংহ যখন দেশে ফিরিয়া গেলেন তখন তাঁহার রাজ্য শত্রু কবলিত। অগত্যা ছত্রসিংহ শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসিলেন এবং যজ্ঞকারী রাজাগণের অর্থাৎ গৌড়বংশীয় ব্রহ্মজিৎ, ধর্ম্মধ্বজ উভয় ভ্রাতা এবং ত্রিপুর রাজা ধর্ম্মধরের নিকট এদেশে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলে, তাঁহারা উভয় রাজ্যের সন্ধিস্থল হইতে ছত্রসিংহকে একটি রাজ্যখণ্ড পৃথক করিয়া দেন। আদম আইল পাহাড়ের (পাথারিয়ার পাহাড়ের) পর দুআইল পাহাড়, তাহার অগ্নিকোণে ছত্রসিংহ অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে একজন মাগধী রাজা দিগ্বিজয় করার জন্য শিবির সংস্থাপন করায়—ইহাকে মাগধী পাহাড় বলিয়া অভিহিত করা হইত। ঐ স্থান পুনর্ব্বার মাগধী ছত্রসিংহের অধিকারে আসে। ছত্রসিংহ যে পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন তাহার নাম হয় ছত্রচুড়া। ছত্রসিংহের কন্যার নাম কাঞ্চনমালা। প্রথম বয়সে পুত্রসন্তান না হওয়ায় ছত্রসিংহ গৃহজামাতা আনয়ন করেন। বৃদ্ধকালে রাজার এক পুত্র হওয়ায় কাঞ্চনমালা ও গৃহ-জামাতাকে তিনি খণ্ড ভূমি পৃথক করিয়া দেন।

তৎপর গৌড়গোবিন্দের প্রায় সমকালেই আমরা ঐ বংশীয় কনক সিংহের নাম পাই। কনক সিং ত্রিপুর রাজা রত্ন মাণিক্যের ভগ্নী বিবাহ করেন। কনক সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহ ও জগৎ সিংহ ও কন্যা শান্তিপ্রিয়া। শান্তিপ্রিয়াকে গরুড়ধ্বজ (রাজা গোবর্দ্ধনের পুত্র) বিবাহ করেন।

শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বাংশে ছত্রসিংহ, কাঞ্চনমালা, কনক

সিংহ, প্রতাপ সিংহ, জগৎ সিংহ প্রভৃতির রাজ্য ছিল। সেই অঞ্চলে ছত্রচুড়া পর্ব্বত, প্রতাপগড়, জগৎ সিংহের গড়, রাজবাড়ী ইত্যাদি স্থান এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত প্রতাপগড়ের প্রাচীন নামই সোনাইকাঞ্চনপুর, কাঞ্চনমালার গল্প ইত্যাদি হইতে হট্টনাথের পাচালী লিখিত কাহিনীর কতটা সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে প্রতাপ সিংহ, জগৎ সিংহ শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের মগধ রাজ্যের শেষ রাজা প্রতাপ সিংহ বা জগৎ সিংহ।

তুঙ্গনাথাঞ্চল বা তরপ

পাচালী মতে দেখা যায় যে তুঙ্গনাথাঞ্চলের পরলোকগত রাজা এপবিষ্ণুর কন্যাকে বিবাহক্রমে গৌড়গোবিন্দের সম্বন্ধী নারায়ণ (আচাক নারায়ণ) তরপের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে এপবিষ্ণুর পুত্র তুঙ্গমাধব নাবালক থাকায় সর্ত্ত ছিল যে তুঙ্গমাধব সাবালক হইলে সে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তখন নারায়ণ সেনাপতি হইবেন। অতিরিক্ত যে সমুদায় ভূমি নারায়ণ নিজ আয়ত্তে আনিতে পারিবেন তাহাতে তাঁহার অধিকার অক্ষুন্ন থাকিবে। নারায়ণের পুত্রসন্তান হইলে, এপবিষ্ণুর দৌহিত্র মূলে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হইবে ইত্যাদি। হট্টনাথের পাচালীতে নারায়ণের (আচাক নারায়ণের) পরিচয় এইমাত্র পাওয়া যায় যে নারায়ণ রংপুরাঞ্চলের শিখীধ্বজ রাজার পুত্র, নীলধ্বজ রাজার পৌত্র। পার্ব্বত্যগণ তাহাদের রাজধানী আক্রমণ করিলে রাজপুত্র নারায়ণ, রাজকন্যা হীরাবতী ও নিজ পুত্র ঝাটুকে লইয়া পরিচারিকা মাণ্ডবী অরণ্য পথে পলায়ন করে। গুরুগিরীধারী তাহার শিষ্যগণসহ যখন মিথিলা আশ্রম হইতে পাণ্ডুয়া আশ্রমে ফিরিতেছিলেন তখন তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় করতোয়া নদীতীরে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন। [বিশ্বকোষ গ্রন্থে, ৺ রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের রাজমালা গ্রন্থে রংপুরাঞ্চলের (কামতাপুর) নীলধ্বজ রাজার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তবে হট্টনাথের পাচালীর সহিত সময়ের কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।] আচাক নারায়ণ তরপের শেষ রাজা। হঠাৎ তরপের সিংহাসন প্রাপ্তিতেই বোধহয় তাহাকে আচাক (আচমকা) নারায়ণ বলা হয়। আচাক নারায়ণ গৌড়রাজা গোবিন্দের সম্বন্ধী ছিলেন।

দেখা যাইতেছে ভৃত্য ঝাটু, গৌড়রাণী হীরাবতী এবং আচাক নারায়ণের স্বদেশীয়

বাল্যসঙ্গী। বোধহয় ঝাটু তরপ এবং গৌড় উভয় স্থানেই সময় সময় থাকিত। মুসলমানগণ শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অপর্ণা, গৌড়গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, হীরাবতী ও শান্তিপ্রিয়া প্রভৃতি পেচাগড় দুর্গে আশ্রয় নেন ও কিছুকাল তথায় গোপনে অবস্থিতি করেন। তখন ঝাটু তাহাদিগকে তরপ লইয়া যাইতে চাহিলে গৌড়গোবিন্দ ও হীরাবতী ইহাতে সম্মত না হওয়ায় অপর্ণা, খঞ্জ যুবরাজ গরুড় ও বধু শান্তিপ্রিয়াকে লইয়া ধানু হাটার ঘাট হইতে ঝাটু গোপনে নৌকাযোগে তরপের দিকে পলায়ণ করে। [শ্রীহট্ট আদালত সমুহের উত্তরদিকবর্ত্তী ঝিল বা জল্লার উত্তর পূর্ব্ব কোণের স্থানকেই ধানু হাটার ঘাট বলা হইত বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন]। গরুড়ধ্বজ, অপর্ণা ও শান্তির তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস ইতিপূর্ব্বেই (৯ম পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ

হট্টনাথের পাচালীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সূত্র, যেমন—ভবানন্দ রায়ের আবাস স্থল বরশালা হইতে পীঠস্থান দুই ক্রোশ বা চারি মাইল পূর্ব্বদিকে। ক্ষেত্রপাল রাজার সময়ের গৌড় রাজধানীর সীমা দিতে গিয়া ঐশান্তেতেগ্রীবাপীঠ, এবং পীঠস্থানের সন্নিকটে কালা বাবার রামকানাইর থলা ইত্যাদি হইতে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরের প্রায় ৮৷৯ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত কালাগুল চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত কালীথানকে শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শ্রীহট্টের শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের অন্তর্ধান ১৩০২ খৃঃ। জৈন্তার শেষ রাজবংশের স্থাপয়িতা পর্ব্বতরায় যাহার পরবর্ত্তী সময় হইতেই জৈন্তার ইতিহাস কিছু কিছু মিলিতেছে সেই পর্ব্বত রায়ের রাজ্যকাল ১৫০০ খৃঃ নিকটবর্ত্তী সময়ের—অর্থাৎ গৌড়গোবিন্দের পতনের প্রায় ২০০ শত বৎসরের পরবর্ত্তী কালের। গতিকে শ্রীহট্টের ৮৷৯ মাইল দূরবর্ত্তী কালাগুল প্রভৃতি স্থান গৌড়ের কি জৈন্তার অন্তর্গত ছিল তাহার মীমাংসায় পাঠান মোগল আমলের ইতিহাস বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না।

বরশালা মৌজা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ৩৷৪ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌড়রাজাগণের সভাসদ প্রভৃতির আবাস স্থল বরশালা ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। পীঠস্থান যে স্থানে অবস্থিত ইহা উক্ত বরশালা মৌজা হইতে মাত্র ৩৷৪ মাইল

দূরবর্ত্তী হইবে। সম্ভবতঃ এককালে ঐ স্থান বরশালার অন্তর্গত থাকিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্গা পূজা উপলক্ষে নানা দেশবাসিনী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। সেইভাবে শ্রীহট্টের দেবী "শ্রীহট্ট বরবাসিনী" বলিয়া পূজিতা হন। "শ্রীহট্ট বরবাসিনী" বলিতে বরশালা বাসিনী গ্রীবাপীঠকে লক্ষ্য করা হয় কি না বিবেচ্য।

গৌড়গোবিন্দের পেচগড় বা পেচাগড় দুর্গ কালাগোলের পীঠস্থানের নিকটবর্ত্তী। ইহাদ্বারাও কালাগুল প্রভৃতি স্থান গৌড়রাজাগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা উপলব্ধি করা যায়।

কালাগুল, বরশালা প্রভৃতি স্থান উত্তরকচ্ছ বা উত্তরকাছের অধীন। উত্তরকাছ তথা বরশালা প্রভৃতি স্থান পরবর্ত্তীকালেও কখন জৈন্তার অন্তর্গত ছিল বলিয়া জানা যায় না।

ঐ সকল আলোচনার সময় ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে গৌড় ও জৈন্তার মধ্যে গৌড়ই শ্রেষ্ঠ রাজ্য ছিল। কালাগোলের 'কালীথান" গৌড় রাজধানী হইতে ৪।৫ মাইল, এবং জৈন্তা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রফলকে (১০৪৯ খৃঃ নিকটবর্ত্তী সময়ের) "গাম" শব্দের বহু ব্যবহার, হড়ীগঙ্গ বা হাড়ীগাঙ্গের উক্তি ইত্যাদি হইতে বুঝা যায় যে পূর্ব্বকালে গৌড়রাজাগণের রাজ্য বর্ত্তমান জৈন্তার ও অংশবিশেষে বিস্তৃত ছিল। উপরোক্ত আলোচনা হইতে কালাগুল যে গৌড়ের অধীন ছিল তাহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কালাগোলে, পীঠপ্রস্তর বালুকা মধ্যে প্রোথিত ও নিম্নগামী, উত্তর দক্ষিণে লম্বমান একটী কাল প্রস্তর। ইহাতে গ্রীবা চিহ্ন আছে। উক্ত পীঠ প্রস্তরের উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখী শিরশিরী নামক একটি পার্ব্বত্য স্রোত প্রবহমান ছিল। অল্পদিন হইল পীঠস্থানের উভয় দিক ভরাট ক্রমে ঐ স্রোতের কিঞ্চিৎ গতি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তবুও বৎসরের প্রায় সময়েই পীঠ গহ্বর মধ্যে জল থাকে। পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ জ্বালামুখী মহাপীঠ কালাগোলের ন্যায় পর্ব্বত পার্শ্বে একটী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী মধ্যে অবস্থিত। (৺ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের "ভারত ভ্রমণ")।

হিন্দুদের তীর্থ ও গঙ্গার একত্র সমাবেশ বাঞ্ছনীয়। তদুপরি ঐ সকল স্বাভাবিক উৎস বা জলস্রোত দ্বারা ঐ সকল স্থান পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ থাকে। গঙ্গাজলের ন্যায় পীঠবারির ব্যবহার হিন্দুদের মধ্যে আছে। এখনও অনেক স্থলে মহাপীঠ গুলিকে নিম্ন ভূমি বা গহ্বরে অবস্থিত দেখা যায়। ইহার একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে ঐ সকল স্থানে কোন কালে পীঠ নদী বা উৎসের বিদ্যমানতা। কালাগোলে পীঠস্থানের অতি সন্নিকটে, ঈশান কোণে শিব প্রস্তর (পীঠ ভৈরব) বিদ্যমান। কালাগোলের "কালীথানকে" স্মরণাতীত কাল হইতে নিকটস্থ প্রাচীন অধিবাসী (পাত্তরগণ) পূর্ব্বেকার অস্পষ্ট স্মৃতি অনুসারে কালী ও মহাদেব নামে পূজা করিয়া আসিতেছে। সময় সময় দক্ষিণকাছ, আখালিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণ মানস পূজাদি আদায় করিতেন এবং ইহাই যে গ্রীবাপীঠ তাহা কাহার কাহারও ধারণা ছিল বলিয়া বর্ত্তমানে প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ বহুকাল যাবৎ সাধারণ্যে অপ্রকাশিত। ৪০।৪২ বৎসরের পূর্ব্বের স্থানীয় পত্রিকাদি আলোচনায় বুঝা যায় যে শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ লুক্কায়িত —ইহা একটী গুপ্ত পীঠ বলিয়া অনেকেরই তৎকালে ধারণা ছিল। কোন কোন তান্ত্রিক পরিবারে ঐ গুপ্ত পীঠ শ্রীহট্টের ঈশান কোণের দিকে আছে বলিয়া একটী ধারণা ছিল। কেহ কেহ ইদানীং ঐ অতিক্ষীণ কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর ক্রমে শ্রীহট্টের ঈশান কোণের দিকে অবস্থিত রায়নগরের শ্রীদুর্গাবাড়ীকে (ইহা ১৭৮০ খৃঃ স্থাপিত একটী দেবালয়) গ্রীবাপীঠ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। কালাগোল শ্রীদুর্গা বাড়ী হইতেও প্রায় ৩।৪ মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত।

আবার কাহার কাহারও এই প্রকার ধারণা ছিল যে শাহজলালের দরগায়ই ঐ মহাপীঠ ছিল। আমাদের মনে হয় এই প্রকার ধারণার উৎপত্তি নিম্নলিখিত কারণে হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে মনারায়ের টীলার পশ্চিমদিকস্থ কংসনিসূদনের প্রস্তর মন্দির ও ইহার পরিণতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কংসনিসূদন রাজার কুলদেবতা ছিলেন। উক্ত মন্দির রাজবাড়ীর (যাহা সম্ভবতঃ পীর মহল্লা প্রভৃতি স্থান লইয়া ছিল) সন্নিকটে থাকা স্বাভাবিক। হট্টনাথের পাচালী হইতে দেখা যায় যে দরগা মহল্লায় দরগা টীলার চতুর্দ্দিকে যে মাঠ দৃষ্ট হয়— তাহা বনবিহারের মাঠ ছিল। ঐ সকল স্থানে বনবিহারের মেলা

ইত্যাদি হইত। সম্ভবতঃ কংসনিসূদনেরই বনবিহার হইত। কংসনিসূদন আপন মন্দির হইতে সন্নিকটবর্ত্তী বনবিহারের মাঠে যাইতেন। ইহাই অনুমান হয় যে গৌড়বংশের অবসানের পর বিপুল রাষ্ট্রবিপ্লবে ও অন্যান্য নানা কারণে লোকে ক্রমে হট্টনাথ, হট্টকালী, মধুকৈটভারি, কংসনিসূদনের নাম ভুলিয়া গেলেও গ্রীবাপীঠকে (ভারতীয় একটী তীর্থস্থান থাকায়) এত সহজে ভুলিতে পারিল না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন পীঠের সন্ধান না পাইয়া দরগা মহল্লার ধ্বংস প্রাপ্ত বিখ্যাত দেবস্থান (কংসনিসূদন) স্থলে শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ ধ্বংস হইয়াছেন বলিয়াই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন।

১৯০৩ ইংরেজীতে শ্রীহট্ট সহরের প্রায় দেড় মাইল অগ্নিকোণে সুরমা নদীর অপর পারে গোটাটিকর নামক স্থানে শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠের ঘোষণা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুগোল, ইতিহাস, পঞ্জিকা, রেলওয়ে গাইডে ঐ স্থান শ্রীহট্টের মহাপীঠ বলিয়া উক্ত হইতেছে।

B. C. Allen এর আসাম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত হইতেছে যে— "This pith has recently been rediscovered. Satis neck is represented by a piece of flat rock Similar to those found in most of the tilas round Sylhet. অর্থাৎ গেজেটিয়ার গ্রন্থে বলা হইতেছে "ঐ পীঠ ইদানীং পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীহট্টের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত প্রায় টিলাতেই যে প্রকার পাথর দেখিতে পাওয়া যায় সেই রকম একখণ্ড চেপ্টা পাথরকেই সতীর গ্রীবা বলা হইতেছে।"

গোটাটিকরে পীঠস্থান কোন প্রকার কিম্বদন্তী, পীঠলক্ষন, তুলনা মুলক আলোচনা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বর্ত্তমানে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে প্রকৃত মহাপীঠকে না পাইয়া গোটাটিকরে একটি প্রতিনিধি পীঠেরই ঘোষণা করা হয়। *

---

*শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে "শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ" সম্বন্ধে ১১।১২।৩৮ইং তারিখে যে আলোচনা সভা হয় তাহার বিবরণ পরিষদ পত্রিকা ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৬৪—৬৬ পৃষ্ঠায় উঠিয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (৬৬ পৃঃ) "গোটাটিকরে আদি পীঠ ছিল না বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন'' বলিয়া উক্ত হইতেছে।

গোটাটিকরবাসী ৺ দেবীপ্রসাদ দাস মহাশয় দ্বারা ভৈরবী স্থাপনের পূর্ব্বে ঐ স্থানে কোন দেবস্থান ছিল বলিয়া কোন কিম্বদন্তী ছিল না। তৎপর গোটা-টিকরবাসী ৺বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ মহাশয় গোটাটিকরের শিব আবিষ্কার করেন। তৎকালিন পত্রিকা ইত্যাদি আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে সেই সময়ে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলে—

"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি॥"

ঐ পংক্তিদ্বয়ের প্রতি কাহার কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রীহট্টে প্রচ্ছন্ন গ্রীবাপীঠের জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছিল। তখন পূর্ব্বোক্ত ভৈরবীবাড়ীর ঈশান কোনের দিকে নবাবিষ্কৃত শিব দেখিতে পাইয়াই অন্যান্য পীঠ লক্ষণ, কিম্বদন্তী ইত্যাদির বিবেচনা না করিয়াই লুপ্তপীঠের সন্ধান মিলিয়াছে মনে করিয়া, নিতান্ত উৎসাহে তাড়াতাড়িতে গোটাটিকরে পীঠ ঘোষণা করা হয়। ইহার কতকটা আভাস শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হইতেও পাওয়া যায়।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গোটাটিকরে পীঠ ঘোষণার অল্পকাল পূর্ব্বে শিব আবিষ্কার হওয়ায় এবং শিব আবিষ্কার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হওয়ায় ঐ শিবই শ্রীহট্টের মহাপীঠ এইপ্রকার ধারণা এখনও বহুলোকের আছে। (পীঠ স্থানে শক্তিরই অধিষ্ঠান, শিব পীঠ রক্ষক ভৈরব মাত্র)।

গোটাটিকরে যে প্রস্তরদ্বয়কে গ্রীবা মহাপীঠ বলা হইতেছে তাহার চতুর্দ্দিক ও অনুরূপ ঝাওয়া প্রস্তরময়। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর দুইটীর চতুর্দ্দিক বাধাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। গতিকে গোটাটীকরে ভৈরবী প্রস্তরের পরিমাণ কতটুকু তাহা বলা যায় না।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের "গোটাটিকরে গ্রীবাপীঠ অনুমান মাত্র" "গোটাটিকরে পীঠস্থান বলিয়া যে আখ্যায়িকার উৎপত্তি তাহা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নয় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে" ইত্যাদি মন্তব্য এবং "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ" পুস্তিকা প্রকাশের পর স্থানীয় পত্রিকাদিতে যে সকল প্রবন্ধ উঠিয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

গোটাটীকরে পীঠ স্থানে কোন জলস্রোত, উৎস বা গহ্বর দৃষ্ট হয় না। পীঠ প্রস্তরে গ্রীবা চিহ্ন নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উপরোক্ত ঝাওয়া প্রস্তরকে মহাপীঠ বলিয়া উক্ত হইতেছে। পরলোকগত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আমরা কোনপ্রকার সমালোচনা করিতে চাহিনা। তবে সকল বিষয় ("গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ" পুস্তিকা প্রকাশের পর ৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্রাদি এবং আরও নানা জিনিষ) পর্য্যালোচনায় ইহাই অনুমিত হইতেছে যে গোটাটিকরে পীঠ প্রকাশ বা ঘোষনার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কারণ গ্রীবাপীঠ শ্রীহট্টের অতি গৌরবের জিনিষ ইহা সর্ব্ব ভারতীয় তীর্থস্থান। তবে মহাপীঠ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকায় শ্রীহট্ট সেই বিশেষ গৌরব হইতে বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা গোটাটিকরে একটি প্রতিনিধি পীঠের ঘোষণা করিয়াছিলেন মাত্র।

যাহাই হউক শ্রীহট্টের--বিশেষভাবে প্রাচীন শ্রীহট্টের একটি স্থানে অরণ্য মধ্যে, স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণ (পাতরগণ) দ্বারা জাগ্রত দেবস্থান ভাবে স্মরণাতীতকাল হইতে পূজিত, অন্যান্য পীঠ লক্ষন কিম্বদন্তী ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত (হট্টনাথের পাচালীও যাহাকে প্রচ্ছন্ন পীঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে) কালীস্থানকে শ্রীহট্টের প্রকৃত গ্রীবাপীঠ না বলিয়া গোটাটিকরে দেবীস্থান যাহা পীঠ লক্ষণ, কিম্বদন্তী, ইত্যাদি কিছুদ্বারাই সমর্থিত নয় তাহাকে শ্রীহট্টের গ্রাবাপীঠ বলা যায় কি? শেষ রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজ্যাবসানের প্রায় ৬০১ বৎসর পরে গোটাটীকরে এবং ৬৩৬ বৎসর পরে কালাগোলে পীঠের অস্তিত্ব ঘোষনা করা হইয়াছে। সময়ের দিক দিয়া এই বা তফাৎ।

যাহাই হউক ৺কামাখ্যা, ৺বামজঙ্ঘা, ৺চন্দ্রনাথ প্রভৃতি পীঠ দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকার পর যদি পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইতে পারেন তবে শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ পুনর্ব্বার প্রতিভা বিস্তারক্রমে প্রকাশিত হইবেন তাহাতে অভিনব কিছু নাই।

হট্টনাথের পাচালী মতে দেখা যায় যে গ্রীবাপীঠের ভৈরবের সর্ব্বানন্দ নাম থাকিলেও হাটকেশ্বর নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। পীঠাধিষ্ঠাত্রী ভৈরব, ভৈরবীর নাম নানা গ্রন্থে নানারূপ আছে।

মন্ত্র চূড়ামণিতন্ত্র	মণিবন্ধে (মণিবন্ধ)	ভৈরবী গায়ত্রী	ভৈরব সর্ব্বানন্দ
	শ্রীহট্টে (গ্রীবা)	ভৈরবী মহালক্ষ্মী	ভৈরব সর্ব্বানন্দ
তন্ত্রচূড়ামণি	মণিবন্ধে (মণিবন্ধ)	ভৈরবী গায়ত্রী	ভৈরব সর্ব্বানন্দ
	শ্রীশৈলে (গ্রীবা)	ভৈরবী মহালক্ষ্মী	ভৈরব সম্বরানন্দ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনিবন্ধে, উভয় গ্রন্থমতেই, ভৈরবী গায়ত্রী ও ভৈরব সর্ব্বানন্দ। গ্রীবা পীঠেও উভয়গ্রন্থমতে ভৈরবী মহালক্ষী, কেবলমাত্র গ্রীবাপীঠের ভৈরবের নাম দুই গ্রন্থে দুই প্রকার। তন্ত্রচূড়ামনি মতে গ্রীবাপীঠের ভৈরব সম্বরানন্দ এবং মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রমতে সর্ব্বানন্দ। মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে মনিবন্ধেও পীঠ ভৈরব সর্ব্বানন্দের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এইভাবে মন্ত্রচূড়ামনিতন্ত্রে সর্ব্বানন্দ ভৈরব দুইবার দুই স্থলে উল্লেখ হইতেছে। সুতরাং গ্রীবাপীঠের ভৈরবের নাম যে সর্ব্বানন্দ তাহা দ্বিধা শূন্যভাবে বলা যায় না। বর্ত্তমানেও পি, এম. বাগচী, গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি পঞ্জিকাতে তন্ত্রচূড়ামনি মতে গ্রীবাপীঠে সম্বরানন্দ ও মনিবন্ধে সর্ব্বানন্দ ভৈরবের উল্লেখ করা হয়। আবার অন্য দিকে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিবের শতনামে উক্ত আছে—

"নকুলীশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ"

অর্থাৎ কালীঘাটে নকুলেশ এবং শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর। এই শতনামে শ্রীহট্টের সম্বরানন্দ বা সর্ব্বানন্দ বা অন্য কোন শিবের নাম নাই। কালীঘাটে সতীর দক্ষিণচরণের চারিটি অঙ্গুলী পতিত হয় "নকুলীশঃ কালীপীঠেদক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ"। কালীঘাটের ভৈরবের নাম নকুলেশ বা নকুলেশ্বর। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত মহালিঙ্গ তন্ত্রোক্ত "নকুলীশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" বাক্যের মধ্যে শ্রীহট্ট পীঠের অর্থাৎ গ্রীবা পীঠের ভৈরবকেই লক্ষ্য করা হইতেছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই শতনাম বহুল প্রচলিত এবং ইহাতে নকুলেশ্বর ও হাটকেশ্বর ব্যতীত চন্দ্রনাথ, বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, জগন্নাথ প্রভৃতি পীঠ ভৈরবগণের ও নামোল্লেখ আছে যথা—

শম্ভুনাথ শ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে।
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ।
নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।
উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে জগন্নাথোঽহংকলৌ।

পীঠ ভৈরবগণের একাধিক নাম ও অনেক স্থলে যে প্রধান প্রধান সেবকের নামে পরিচিত হইয়াছেন তাহার উদাহরণও বিরল নহে। ইহাই অনুমান হয় যে শ্রীহট্টের গ্রীবা পীঠের ভৈরবের সম্বরানন্দ, সর্ব্বানন্দ ইত্যাদি নাম থাকিতে পারে কিন্তু তিনি হাটকেশ্বর নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং এতদঞ্চলে পীঠ ভৈরবীগণ মহালক্ষী, জয়ন্তী. ইত্যাদি নামে সর্ব্বসাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত না হইয়া গ্রীবাকালী, জয়াকালী ইত্যাদি নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ কয়েক শতাব্দী যাবৎ সাধারণ্যে প্রচ্ছন্ন থাকার প্রধান কারণই বিগত কয়েকশতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অন্যান্য কারণে বিভিন্ন দিক দিয়া হিন্দুজাতির অধঃপতন।

(২) নানা কারণে বহুকাল যাবৎ হিন্দুদের মধ্যে ঐতিহাসিক আলোচনার ভীতি। যাহা ক্রমে তাচ্ছিল্যে পরিণত হইয়াছে।

(৩) হিন্দুগণ বড়ই স্বতন্ত্রতাপ্রিয়। তান্ত্রিক সাধকগণ ঐ সকল গুপ্ত সাধনার স্থলকে অন্যের নিকট সহজে প্রকাশ করিতেন না। গতিকে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বিস্মৃতির স্তরের উপর স্তর পড়িতে লাগিল।

(৪) গৌড়রাজগণের আমলের অনেক ব্রাহ্মণ ও ভদ্র পরিবারের বিলুপ্তি বা বরশালা ইত্যাদি স্থান ত্যাগ।

(৫) পরবর্ত্তীকালে শ্রীহট্টে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য।

(৬) উত্তরকচ্ছ বা উত্তরকাছ (যাহার অন্তর্গত বরশালা কালাগোল ইত্যাদি) পার্ব্বত্যভূমি বিধায় ঐ সকল স্থান অতি সহজেই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। গতিকে ঐ সকল স্থান বিগত প্রায় ৬০০ শত বৎসরে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ৮০ ¦ ৯০ বৎসর পূর্ব্বে চা-কোম্পানী জঙ্গল আবাদ না করিলে সেই স্থানে যাওয়া অদ্যাপিও সুকঠিন হইত।

(৭) শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র সম্প্রদায়ের অনেক পরিবারই গৌড়বংশের অবসানের পর মুসলমান আমলে শ্রীহট্টবাসী হয়েন। তাঁহারা পীঠস্থান প্রচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরেই শ্রীহট্ট আগমন করেন; সুতরাং পীঠস্থান সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কিছু জানাও সম্ভবপর নহে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দুজাতির মধ্যে এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐতিহাসিক কৌতূহল বড় জাগ্রত হয় নাই। তাঁহারা ইহার গুরুত্বও উপলব্ধি করেন না। মহাপীঠকে কেহ কেহ অন্যান্য শতসহস্র স্থাপিত দেবালয়ের মত একটা কিছু হইবে বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ঐতিহাসিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে নানা কারণে উদাসীন। ঐ সকল বিষয়ে নিতান্ত হাল্কা ভাবেই চিন্তা করেন। হাল্কা ভাবেই আলোচনা করেন। অধিকন্তু হিন্দুদের মধ্যে জাতি হিসাবে মর্য্যাদা জ্ঞানেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিক বিষয়ে আমরা কি প্রকার উদাসীন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শ্রীহট্টের মুসলমান বিজয় ১৩৮৪ খৃঃ বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইত। কিন্তু আজ প্রায় ২৭ বৎসর যাবৎ নূতন আলোকপাত হওয়ায় দেখা যাইতেছে ইহা ৭০৩ হিজরী বা ১৩০২ খৃঃ। স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে এই সুদীর্ঘ ৮২ বৎসরের ব্যবধান এখনও সংশোধিত হইতেছে না। সেই ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দই চলিয়া যাইতেছে।

৩

হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধার সংক্ষিপ্ত, কামরূপ, গৌড়, শ্রীচন্দ্রল বা ছিরিচন্দ্রল, ব্রহ্মাঞ্চল, গোবিন্দ, শ্রীহট্ট এই সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত। অনুমানিক প্রায় ৩৬০০০ ছয়ত্রিশ হাজার ছত্র পয়ারে লিখিত। উক্ত পাচালীগ্রন্থ খানা আথালিয়ার ভট্টাচার্য্য বংশীয় কবি গনেশরাম শিরোমণি বা গনেশ্বরদ্বিজ গ্রন্থাকারে রচনা করেন। আথালিয়ার ঐ ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড়রাজধানীর নিকটস্থ, সম্মানিত এবং প্রাচীন। অধিকন্তু ৺গণেশরাম শিরোমণি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ৺শিরোমণি হইতে বর্ত্তমানে সপ্তমপুরুষ চলিতেছে।

পাচালী হইতে দেখা যায় যে গৌড়গোবিন্দ গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিলে অতিবৃদ্ধ রাজপণ্ডিত বৃহস্পতি (নিধিপতি বংশীয়, সম্ভবত নিধিপতির প্রপৌত্র) রাজসভায় গৌড় ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। তৎপর গৌড় বংশের অবসানের পর পীঠস্থানে অরণ্যমধ্যে পীঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী বাবা জটাধর ও ভবানন্দ

সংবাদ (ভবানন্দ রায় বরশালাবাসী ছিলেন) । তৎপর ঐ কাহিনী রঘুনন্দন (আথালিয়ার ভট্টাচার্য্যগণের আদি পুরুষ, যিনি বরশালা ত্যাগক্রমে আথালিয়া ব্রাহ্মণশাসনে আসেন) জানিতে পারিলেন। রঘুনন্দন হইতে তৎপৌত্র মুকুন্দ এবং মুকুন্দ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গণেশরাম বা গণেশ্বর সকল কথা জানিতে পারিয়া শ্রীবা কালীর প্রত্যাদেশে হট্টনাথের পাচালী গ্রন্থাকারে রচনা করেন। ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জাহ্নবীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হট্টনাথের পাচালী প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আথালিয়ার ৺কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাপ্ত হন। পরে তিনি ইহার নষ্টের উদ্ধার করেন।

পাচালীর নষ্টোদ্ধার হইতে দেখা যায় যে গণেশ শিরোমণি গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া বার বার শ্রীবাকালীর প্রত্যাদেশের দোহাই দিতেছেন।

গণেশ দ্বিজের সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র রায় অন্নদা মঙ্গল লিখিতে গিয়াও এবম্প্রকার প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলের মুখবন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন যে—সপ্নে দেবী তাহাকে "অন্নদামঙ্গল" রচনা করিতে আদেশ করিলে—

"ভারত কহিছে মাগো নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিছে বাছা না করিও ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখিবে॥" ইত্যাদি—

তৎকালে গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া কোন না কোন দেবদেবীর প্রত্যাদেশের দোহাই দেওয়া সাহিত্যের বেশাতি ছিল নতুবা ইহা জনসমাজে আদৃত হইত না (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। নষ্টের উদ্ধারকারী ও নষ্টোদ্ধার করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র ও গণেশরাম শিরোমণির ন্যায় দেবীর প্রত্যাদেশের দোহাই দিতেছেন। নষ্টোদ্ধারকারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন। তাঁহার এবম্প্রকার সংস্কার থাকাও সম্ভবপর। নষ্টের উদ্ধার করিতে সকল স্থানে অবিকল গণেশরামের সকল ভাষার উদ্ধার হয় নাই। নষ্টোদ্ধার কারীর ভাষা স্থানে স্থানে কিছু আছে। যাহাই হউক আমরা গণেশরাম শিরোমণির রচিত হট্টনাথের পাচালীর নষ্টের উদ্ধার খানি শ্রীযুক্ত জাহ্নবীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে পাইতেছি। এজন্য তিনি শ্রীহট্টবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

হট্টনাথের পাচালীতে শ্রীহট্টের অভিষ্ট দেবতা হট্টনাথের মহিমা কীর্ত্তন মধ্যে মধ্যে কিছু আছে। তবে বিশেষভাবে ইহা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

পাচালীতে প্রাচীন লিখা সুলভ স্থানে স্থানে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। ব্রাহ্মণ ভোজন, বিবাহ-বাসর প্রভৃতির বর্ণনায় রহস্যের মাত্রা অনেক সময় চরমে উঠিয়াছে। অপরদিকে সৃষ্টি রহস্য (বিজ্ঞানতঃ এবং প্রজ্ঞানতঃ) নিয়তি ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে। রাজকুমার বা রাজকন্যার রূপ বর্ণনা, সন্ধ্যার বর্ণনা ইত্যাদিতে ভারতচন্দ্রের ন্যায় উপমা ও কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক স্থানে যেমন হট্টনাথ হট্টকালীর পূজার নিয়ম, হট্টনাথের বর্ণবিজ্ঞান (হট্টনাথ স্বাভাবিক নীলবর্ণ ছিলেন। হট্টনাথের বর্ণ পরিবর্ত্তন বা মলিনতা, রুক্ষতা ইত্যাদি দ্বারা রাজা ও রাজ্যের শুভাশুভ নির্ণয় করা হইত)। হট্টনাথের বর্ণ বিপর্য্যয়ের প্রতিকার, হট্টনাথের পাটস্থানে বা হট্টনাথের উপরে পশুপক্ষী ইত্যাদি মল মূত্র ত্যাগ করিলে প্রতিকার, চটলা চরিত্র, গৌড়ের নবডিঙ্গা, ভবানন্দ যোলদ্বিপের রহস্য, হংসরহস্য, পতঙ্গোপদ্রব, লঘ্নকর ব্যায়াম (সম্ভবতঃ অধুনা লুপ্ত) গুহাগড় (রূপনাথ গুহা), পাণ্ডুয়া (কামরূপের) ও চম্পাবতী আশ্রম কুলসিয়া রাজ্যাভিষেকের ক্রম, শ্রীচন্দন ইত্যাদির বিবরণ অতিমাত্রায় বিস্তৃতভাবে আছে।

পাচালী গ্রন্থখানিতে রাজাগণের বিবরণ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেওয়া আছে যে এবং পাচালীর লিখিত বিবরণের সূত্র অবলম্বনে স্থানীয় অনুসন্ধানে শ্রীহট্ট, উত্তরকাছ অঞ্চল, বরশালা, ভাটেরা, ব্রহ্মচাল ইত্যাদি স্থানে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমাদের মনে হয় যে শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত আপাত বিরোধীয় যে সমুদয় কিম্বদন্তী, প্রবাদ, প্রাচীন ছড়া ইত্যাদি আছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বা ব্যাখ্যা হট্টনাথের পাচালীর দ্বারা করা যায়। গতিকে পাচালী গ্রন্থের ভিত্তি যে সত্যমূলক তাহাতে সন্দেহ থাকে না। পাচালী গ্রন্থ অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে স্থানীয় অনুসন্ধান করিলে আরও তাম্রফলক, প্রাচীন

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় হট্টনাথের পাচালীর নষ্টোদ্ধার পাঠ ক্রমে এ সম্বন্ধে স্থানীয় জনশক্তি ও যুগশক্তি পত্রিকায় "হট্টনাথের পাচালী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা দ্রষ্টব্য।

মুদ্রা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইবে। বর্ত্তমানে যদি ভাটেরার তাম্রফলকদ্বয় পুনর্ব্বার মনযোগের সহিত পাঠ করা যায় তবে আরও ২।৪টি জিনিষ উক্ত ফলক সকল হইতে মিলিবে যাহা পাচালীর লিখিত বিবরণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে। তাম্রফলকের অনেক জিনিষ যাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা সম্ভব হয় নাই, তাহা বর্ত্তমানে হইতে পারে।

শেষরাজা গৌড়গোবিন্দের অন্তর্ধান আজ ৬০০ শত বৎসরের উর্দ্ধে হইতে চলিল। ঐতিহাসিক আলোচনায় বস্তুঘটিত প্রমাণ, তুলনামূলক আলোচনা, যুক্তিতর্ক, কিম্বদন্তী বা চিরাগত প্রবাদের মূল্য আছে। হট্টনাথের পাচালী সম্ভবতঃ চিরাগত প্রবাদের অথবা পূর্ব্বের কোন লিখার উপর নির্ভর ক্রমে লিখিত। সুতরাং এই প্রকার বৃহৎ গ্রন্থের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কথাই যে অকাট্য সত্য হইবে এই প্রকার ধারণা করা অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ ইহার ভিত্তি যদি সত্যমূলক হয় এবং প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে যথেষ্ট বর্ণনার মধ্যে সামান্য ভুল ত্রুটী থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আমাদের মনে হয় হট্টনাথের পাচালী গ্রন্থের ভিত্তি সত্যমূলক। এইস্থানে যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব নহে, তবে অপ্রতক্ষ্য প্রমাণ (Indirect method of proof) দ্বারা যদি ইহার লিখিত বিবরণের সত্যতা উপলব্ধি হয় তবে ইহার নির্ভর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্থলে বর্ত্তমান পুস্তকে লিখিত ভাটেরার তাম্রফলক, জগন্নাথপুরের প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা, গৌড়বংশীয় লাউড় রাজা ভগদত্তের বাড়ী, নবগীর্ব্বাণ প্রভৃতির রাজাগণের রাজধানী শ্রীহট্টে, হট্টনাথই বটেশ্বর, কংসনিসূদন ও মধুকৈটভারির মন্দির শ্রীহট্টে, গ্রীবাপীঠ (কালাগোলে), সুরমা নদীর সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের ইতিহাস, গোবিন্দী, গৌড়গোবিন্দী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইত্যাদি আলোচনা হইতে বোধ হয় পাঠকের ইহার নূতনত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কতক ধারণা হইয়া থাকিবে।

পাচালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জিনিষ যেমন আথালীর বিবরণ, শীলা ও চটলার কাহিনী, কেরলদেশের কথা, হংস রহস্য (গৌড়রাজা ভবানন্দের কালে শ্রীচন্দ্র আবাদ করিবার সময়), পতঙ্গপোদ্রব, হট্টনাথের বর্ণ বিপর্য্যয়ের দরুণ ভবানন্দ রাজার রাজধানী ত্যাগক্রমে রংপুরের খণ্ডরাজ্যে অবস্থিতি (রংপুরাঞ্চলের রাজা ভবচন্দ্র

ও গৌড়রাজা ভবানন্দ সমসাময়িক ছিলেন)। গৌড়রাজা গোবর্দ্ধনের আদমআইল পাহাড়ে গমন ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা, মাধব তীর্থ আবিষ্কার ইত্যাদি; শ্রীহট্ট নামের সৃষ্টি, গুহাগড়ের (রূপনাথ গুহার) প্রাচীন কাহিনী, হট্টনাথের বর্ণ বিজ্ঞান, পুরাণাবন্দর (আখালির উত্তরে কুরসান্দি টীলায় পুরাণাবন্দর বলিয়া স্থানবিশেষকে অদ্যাপিও উক্ত হইয়া থাকে। ইহাই সম্ভবতঃ পুরাণাবন্দর ছিল তৎপরে বন্দর পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসে)। গোবিন্দরণকেশবের কালে উত্তর কাছ ও দক্ষিণকাছের সৃষ্টি, উত্তরকাছে গোবিন্দী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের স্থানলাভ, পাণ্ডুয়া, কুলসিয়া, চম্পাবতী ইত্যাদির (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জিলায়) বিবরণ, ফেচুহাটার উৎপত্তি, বাসন্তি মেলা, রায়নগরের উৎপত্তি ব্রহ্মাঞ্চল ধ্বংসের বিবরণ ইত্যাদি বহু বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। হট্টনাথের পাচালীর সহিত ত্রিপুররাজমালা ইত্যাদি নানা গ্রন্থের ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

হট্টনাথের পাচালী সুবৃহৎ গ্রন্থ। বর্ত্তমানে ইহা টিকাসহ ছাপাইবার সুবিধা না হওয়ায় পাচালী লিখিত প্রধান প্রধান জিনিষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকের প্রথম ভাগে (১—১১ পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে। গৌড় রাজাবলী ব্যতীত লাউড়, জয়ন্তিয়া, মগধ ও তরপের রাজাগণের অপ্রকাশিত নাম (যদি ও শ্রেণীবদ্ধভাবে নয়) দেওয়া হইয়াছে। তত্বানুসন্ধিৎসুগণ অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সকল জিনিষের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

—সমাপ্ত—

Sarada Press, Sylhet.

২৭৬/৩৪।